PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

Rs.1.00
মূল্য ঃ ১ টাকা

MONTHLY
মাসিক

VOL. II Issue : XII, 13th March, 2014 ১৪ ফাল্গুন ১৪২০, বার্ষিক মূল্য - ১০টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

ডাঃ হেনরি নর্মান বেথুন-এর ১২৪ তম জন্মবার্ষিকী
এবং
বেথুন ইন্সটিটিউট-এর নবম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে

স্মারক সংখ্যা

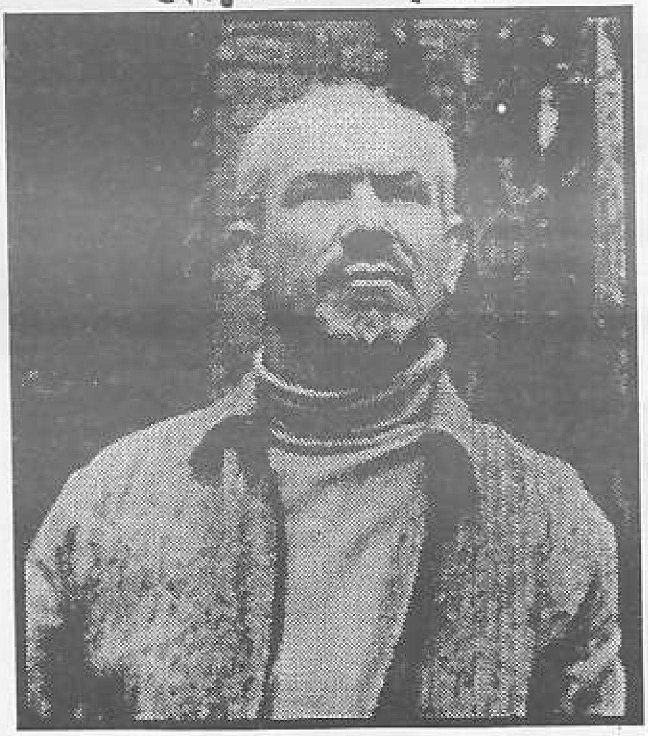

ডাঃ হেনরি নর্মান বেথুন
(১৮৯০ - ১৯৩৯)

ডাঃ হেনরি নর্মান বেথুনের ১২৪তম জন্মবার্ষিকীতে সভাপতির বক্তব্য

পেলব মুখার্জী

৩রা মার্চ, ১৮৯০ মানবতাবাদী মহান ডাক্তার হেনরী নর্মান বেথুনের শুভ জন্মদিন। আর ১৩ই মার্চ,২০০৫ বেথুন ইন্সটিটিউট অফ জেরিয়াট্রিক্স রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার এর শুভ জন্মদিন, এই দুইটি দিনকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আজকের ১৩ই মার্চ এর এই সভায় আপনাদের উপস্থিতি আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধনে সহায়ক হয়েছে বলে আমি মনে করি। আপনাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি।

নর্মান বেথুনের জন্ম কানাডায় কিন্তু সারাজীবনে তার কর্মকান্ড কানাডা ছাড়িয়ে সারা বিশ্বে এক আলোড়ন সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিল। তিনি নিজের যক্ষ্মারোগ নিজের উদ্যেগে অপারেশন করার ব্যবস্থা করেছিলেন ঐ সময় তা ভাবা যায় না, তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে রোগীদের সেবার জন্য ভ্রাম্যমান রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া প্রথম শুরু করেন যেটা কখনো কেউ ভাবতে পারেনি কিন্তু বেথুন নিজেই উদ্ভাবন করেন যে রোগীদের ডাক্তারের প্রয়োজন কিন্তু ডাক্তারদেরও প্রয়োজন রোগীদের সেবা করা। এ কথা আমরা একমাত্র বেথুনের জীবনাদর্শ থেকে অনুপ্রাণিত হয়েছি। ভ্রাম্যমান হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা এও বেথুনের এক অনন্য সৃষ্টি। স্পেনের গৃহযুদ্ধে এবং চীনের ঐতিহাসিক লঙ মার্চে গেরিলাদের সাথে লঙ মার্চে অংশ গ্রহণকারী দলের মধ্যে তিনি এতই জনপ্রিয় হয়েছিলেন যে তার উপস্থিতিতে সৈন্যবাহিনীর মধ্যে দারুণ উৎসাহ, উদ্দীপনা এবং লড়াইয়ের মানসিকতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়েছিল। সৈন্যবাহিনী নিজেরাই বলতেন কমরেড কোন ভয় নেই ডাক্তার বেথুন আমাদের সাথে আছেন। দিবা-রাত্র পরিশ্রম, অনাহরে আহত সৈনিকদের চিকিৎসা করাটাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য হিসাবে তিনি গ্রহণ করেছিলেন এমন কী নিজের আঙ্গুলে আঘাতের দরুন সেপটিক হয়ে যাওয়া অংশে জোগান না থাকায় কোন ওষুধ প্রয়োগ করতে না পারা সত্ত্বেও তিনি রোগীদের অপারেশন চালিয়ে গিয়েছেন, নিজে ডাক্তার হয়েও নিজের স্বাস্থ্য সম্পর্কে এককথায় উদাসীন ব্যাক্তির কথা ভাবা যায় কী? শুধু তাই নয়, দারিদ্রে জর্জ্জরিত নর্মান বেথুন চিকিৎসা কে মানব সেবায় রূপান্তরিত করার স্বার্থে আমেরিকা, কানাডা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের দরিদ্র রোগীদের সেবা করার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন যা তার অভিজ্ঞতা লব্ধ হয়েছিল যা তিনি পরবর্তীতে কাজে লাগাতে পেরেছিলেন, বর্তমান সময়ে একথা বলা যায় যখন আমরা ডাক্তারদের ফি এবং ওষুধপত্রের জন্য চিকিৎসা করাতে পারিনা। সেই সময়ে যা আরও কঠিন সময় ছিল যা সকলেই অনুমান করতে পারেন। তাঁর এই আত্মদান এবং সেপটিক থেকে গ্যাংগ্রিন হয়ে যাওয়ায় চিকিৎসারত অবস্থাতেই তাঁর জীবনাবসান ঘটে, এরকম মানব সেবায় নিয়োজিত ডাক্তার কখনও দেখা মেলা ভার। তাঁর মৃত্যুর পর দেশে দেশে বেথুনের নির্দেশিত পথই যে মানবসেবায় শ্রেষ্ঠ পথ তা বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

চিন, কানাডা সহ সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে গড়ে ওঠে বেথুন নির্দেশিত পথে জনস্বাস্থ্য আন্দোলন। সেই উদ্দেশ্যে আমরা গঠন করেছি আমাদের ইন্সটিটিউট আমাদের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিমল চ্যাটার্জীর প্রেরণায়।

২০০৫ সালের ১৩ই মার্চ তারিখে বেথুন ইন্সটিটিউট অফ জেরিয়াট্রিক্স রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার গঠিত হওয়ার পর থেকে আমরা বেথুনের আদর্শকে রূপায়িত করার জন্য কাজ করে চলেছি। যার জন্য ডাক্তারবাবুদের বেথুনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রোগীদের সেবা করার আদর্শে আমরা নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। নর্মান বেথুন বেঁচে আছেন মানুষের হৃদয়ে। মানব সভ্যতার ক্ষেত্রে তার আদর্শ রূপায়িত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে এগিয়ে আসার জন্য সকলকে আবেদন করছি।

বার্দ্ধক্যের বিলাপ (স্মৃতি চারণ)

গৌরীপদ দত্ত

৩রা মার্চ নর্মান বেথুনের জন্ম তারিখ ১৩ই মার্চ ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠা হয় নর্মান বেথুন জিরিয়াট্রিক্স ইনসটিটিউট প্রতিষ্ঠা করেন ব্যতিক্রমী শ্রমিক নেতা প্রয়াত বিমল চ্যাটার্জি এবং তার সহযোগী বৃন্দ। জয় ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিক ইউনিয়নের অবদান এই প্রতিষ্ঠান নির্মাণ ও পরিচালনাতে সর্বাধিক। এক শ্রমিক সংঘের অভিনন্দন যোগ্য কাজ।

বন্ধু বিমল চ্যাটার্জির চিন্তনে শ্রমিক কল্যাণের ভিত্তি কেবল অর্থনৈতিক দাবী দাওয়াতে আবদ্ধ ছিলনা। শ্রমজীবীদের জীবনের সার্বিক উন্নয়নই তাঁর লক্ষ ছিল। সেই সূত্রে তিনি নানাবিধ প্রচেষ্টা করেছেন। সমস্ত মানুষের জীবন বিকাশের মূল ভিত্তি শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য। এই দুই বিষয়কে সমাজ পরিচালকবৃন্দ সেবামূলক কাজ হিসাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। প্রকৃত পক্ষে এই দুটি বিষয়ই শোষণমূলক সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম হাতিয়ার। এই উপলব্ধিতেই আমার এবং বিমল বাবুর বন্ধুত্বের বন্ধন। আমরা দুজনেই এক সময়ে কমিউনিস্ট পার্টির (মার্ক্সবাদী) কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য ছিলাম। সেই সূত্রে এবং চিন্তার সাযুজ্যে আমিও তাঁর কর্মপ্রচেষ্টার সহযোগী ছিলাম। বলা উচিত তিনিই আমাকে তাঁর সহযোগী হবার মর্যাদা দিয়েছিলেন। কানাডা বাসী প্রখ্যাত শল্য চিকিৎসক নর্মান বেথুন তাঁর চিকিৎসা বিদ্যাকে সমাজ পরিবর্তনের স্বার্থে নিয়োজিত করেন, মানব মুক্তির যুদ্ধে তিনি তাঁর স্বদেশের গন্ডী অতিক্রম করে স্পেনের 'সিভিল ওয়ার' এবং মহাচীনের জনগনতান্ত্রিক আন্দোলনে ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিজেকে উৎসর্গ করেন। সমরক্ষেত্রে তাঁর উপস্থিতি সেই সংগ্রামের সৈনিকদের উৎসাহিত করতেন। স্লোগান ওঠে Comrades March forward! comrade doctor Bethune is with us তাঁর বিশ্বাস ছিল একটি মুক্তিযোদ্ধাকে বাঁচানোর অর্থ মুক্তির প্রয়াসকে এক কদম এগিয়ে নেওয়া। এই বিশ্বাসেই তিনি সাধারণের অসাধ্য কাজ দিনে প্রায় আঠারো ঘন্টাই চিকিৎসা করতেন যুদ্ধাহত সৈনিকদের। এই মহৎ মানুষটির জীবনী The Sealpal -The sword' এ তার বৈষম্যমূলক সমাজ পরিবর্তনের অনন্য প্রচেষ্টা বিবৃত আছে। বেথুন ইনসটিটিউটের কর্মীদের এই প্রচেষ্টাই তাদের অভীষ্ট।

পুঁজিবাদ ভিত্তিক ভোগবাদী সমাজে মানব মননের মূল্যবোধের অবক্ষয়, অসহনীয় কিন্তু প্রত্যাশিত পরিণতি। এই অবমূল্যায়ণে অন্তহিত যৌথ পরিবার। যার অন্যতম ভুক্তভোগী ক্রমবর্দ্ধমান বৃদ্ধ জনগোষ্ঠি। প্রাকৃতিক নিয়মেই বার্দ্ধক্য, জরা এবং মৃত্যু জীব জগতের নিয়তি। বর্তমান সময়ে নিউক্লিয়ার ফ্যামিলি বৃদ্ধদের পরিচর্যাতে অক্ষমতায় বিব্রত। এককেন্দ্রিক অর্থাৎ ইউনি ফ্যাক্টোরিয়াল অথচ উন্নত চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৌলতে মানুষের প্রত্যাশিত আয়ু অর্থাৎ লাইফ এক্সপেকটান্সির উর্দ্ধ গতি বার্দ্ধক্যের সমস্যাকে জটিলতর করেছে। এখন 'পঞ্চাশোর্ধে' বনং ব্রজেৎ' এর ফতোয়া অচল। অনেকের জীবন শুরু হতেই পঞ্চাশ পার হয়ে যাচ্ছে।

বার্দ্ধক্যের এই ভাবনাতেই বেথুন ইনসটিটিউট অফ জিরায়াট্রিকস্ এর নির্মাণ।

বার্দ্ধক্যে ব্যাধি এক বিশাল সমস্যা যা বৃদ্ধদের আশু আর্তি, এই সময়ের অসুস্থতার চিকিৎসা খুবই জটিল ও ব্যয়সাপেক্ষ। বর্তমান চিকিৎসা ব্যবস্থা নানা প্রয়োজনীয় এবং বহুক্ষেত্রে অপ্রয়োজনীয় পরীক্ষানিরীক্ষা ও মহার্ঘ ওষুধ ও পরিষেবা নির্ভর। চিকিৎসা বিজ্ঞান এখন একাভিমুখী অর্থাৎ ইউনি ফ্যাক্টোরিয়াল যদিও বিজ্ঞানিরাও

জানেন অসুস্থতা বাস্তবিক ক্ষেত্রেই বহুধাভিমুখী কারণেই অর্থাৎ সমষ্টি ফ্যাক্টোরিয়াল প্রভাবেই সংঘটিত। রোগীর মৃত্যু অবধাবিত জেনেও তাকে বাঁচিয়ে? রাখার প্রচেষ্টায় মানবিকতার অন্তরালে চিকিৎসা কেন্দ্রের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি ও প্রবাহিত। আবার, কেন সবরকম চিকিৎসার চেষ্টা করা হয়নি, এই গাফিলতির অভিযোগে চিকিৎসকরা নিগৃহীত হওয়া এবং চিকিৎসা কেন্দ্রে হামলা ঘটনাও ক্রমবর্ধমান। ঘটনাগুলির বিশ্লেষণে নানা অভিসন্ধি ও যে কাজ করছে তা বোঝা দুরূহ নয়। এই প্রেক্ষিতে গোটা চিকিৎসা ব্যবস্থাই এক সঙ্কটের মধ্যে চলেছে। বৃদ্ধরাই বেশী ভুক্তভোগী।

বৃদ্ধদের ব্যাধি ছাড়াও আরো কিছু গভীর সমস্যা আছে। সেটা মূলত মানসিক। নিঃসঙ্গতা, জীবনাদর্শের অশুভ পরিবর্তন সংসারে কর্তৃত্ব হানি এ সমস্তই বৃদ্ধদের জীবনকে বহু ক্ষেত্রেই দুর্বিসহ করে তোলে।

আমার এক বন্ধুর দোর্দন্ড প্র তাপ পিতাকে বৃদ্ধ বয়সে বলতে শুনেছি - 'বুঝ্ছো আগে সংসারে ছিলাম কর্তা। এখন হয়েছি কুত্তা। কথাটা অতিশয়োক্তি নিঃসন্দেহে কিন্তু বাস্তবতা বিমুক্ত নয়।

এই প্রতিষ্ঠান নির্মাণের সময় আমার বক্তব্যছিল বার্ধক্যের সামাজিক দিকটার উপর জোর দেওয়া। দক্ষ সংগঠক বিমল বাবু বৃদ্ধদের আশু প্রয়োজন চিকিৎসার উপর গুরুত্ব দেন। এই মত পার্থক্য সত্বেও আমাদের সৌহার্দ ক্ষুন্ন হয়নি।

আমার এখনো বিশ্বাস বৃদ্ধদের নানাভাবে পুনর্বাসন প্রচেষ্টার পরিবর্তে তাদের দেহ মনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিকে সহনীয় করার শিক্ষার গুরুত্বই সর্বাধিক। ব্যক্তি জীবন পরিবার, সংগঠন, সর্বত্রই old order changes giving place to new' নিজেদের দিকে তাকালে বোঝা যাবে আমরা আমাদের পিতা পিতামহের আদর্শ ও জীবন যাত্রা মত আমরাই চলিনি। গড়ে ওঠে আমাদের নিজস্ব মত ও পথ। সুতরাং আমাদের পুত্র কলত্ররা আমাদের মতানুবর্তি হবে ভাবলে মানসিক অশান্তিই বাড়বে।

বিশ্ববিখ্যাত ইংরেজ ক্রিকেটার জ্যাক হবস্ বেরা বেশকিছুক্ষণ ব্যাট করার পর, আম্পায়ার তাকে 'আউট' ঘোষণা করেন, ঘোষণার পরেই নিজের ভুল বুঝতে পেরে তিনি জ্যাক হব্স্ এর কাছে মার্জনা চেয়ে নিজের ভুল সিদ্ধান্ত বাতিল করে ওঁকে আবার ব্যাট করতে অনুরোধ করেন। প্যাভলিয়ন মুখী মি. হবস্ বলেন আমিতো অনেকক্ষণ খেলেছি এবার অন্যরা খেলুক!

এই বৃদ্ধ বয়সে মধ্য আশিতে তাই বলি অনেক দিনতো নানা কাজে নিজেকে জড়িয়েছি। এখন অন্যেরা তাদের ইচ্ছা মত কাজ করুক। শুধু দুঁদে দাবাড়ু কৈলাস খুড়োর মত কেউ যদি কোন জটিল চাল বোঝার সাহায্য চায় তাহলে তা দিতে অসম্মত হবো না। এই আর কি! বর্তমানে শারীরিক অক্ষমতার জন্যে এই প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ডে যুক্ত হতে না পারায় মনে বেদনা বোধ আছে, আরো একটা গোপন শঙ্কায় শঙ্কিত থাকি, নুতন প্রজন্মকে এই প্রতিষ্ঠানের মত জনহিতকারী কাজে খুব আগ্রহী হতে দেখছি না। সময়টা এখন বহুলাংশে ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির ধান্ধায় নিমগ্ন। এই পরিস্থিতিতে বেথুন ইনস্টটিটিউটের কর্ণধারদের উৎসাহী তরুণ কর্মীদের যুক্ত করা খুবই দরকার। কাজটা কঠিন, কিন্তু না করতে পারলে প্রতিষ্ঠানটিকে সার্থক করার সম্ভাবনা কমতে বাধ্য। আমি আশা করব তরুণ সমাজ মনস্ক কর্মীরা এসে এই প্রতিষ্ঠানকে সমৃদ্ধ করবে। এই প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন, অন্ততঃ, নিকটবর্তী বিদ্যালয়ে এই প্রতিষ্ঠানের কথা জানানো প্রয়োজন। কর্মকর্তাদের কাছে এই নিবেদনটি রাখলাম।

বেথুনকে কীভাবে স্মরণ করব
মৃগেন্দ্রনাথ গাঁতাইত

ডাঃ বেথুনকে আমরা স্মরণ করি কারণ বেথুনের জীবনের কিছু শিক্ষা আমাদের নিশ্চয়ই ভাল ল তাহলে আমাদের চেষ্টা করতে হবে এমন কিছু কাজ করতে যাতে বেথুনের আদর্শগুলোর কিছুটা অন্ততঃ অ রূপায়িত করতে পারি।

৭০ বছরের বেশি আগে বেথুন মারা গেছেন। এর মধ্যে পৃথিবীতে সমাজের বেশ কিছু পরিবর্তন হ যদিও সমাজব্যবস্থার অসুখের মূল লক্ষণগুলো প্রায় একই রকম রয়ে গেছে। বেথুন উপলব্ধি করেছিলেন মু কীভাবে দেশে দেশে যুদ্ধ তৈরি করে, মুনাফা কীভাবে চিকিৎসা পেশাটাকে কলুষিত করছে। বেথুনের জী আরো শিক্ষা হল - ছোট ছোট কাজেও নিষ্ঠা, মানুষকে সমাজের অংশ হিসাবে দেখা তাহলে চিকিৎসা ক গেলেও সমাজব্যবস্থার কথা মাথায় রেখেই চিকিৎসার নিদান ভাবতে হবে।

বেথুন পেশায় চিকিৎসক ছিলেন। তাই, চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্য বিষয়ে তাঁর উপলব্ধি অনেক গভীর হয়ে কিন্তু সাধারণভাবে সমাজ ও রাজনীতি বিষয়ে তাঁর চিন্তা খুব স্বচ্ছ ও বলিষ্ঠ ছিল। আমি নিজে একজন চিকিৎ তাই চিকিৎসক হিসাবে আজকের দিনে আমাদের কী করণীয় সে সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য রাখছি। অন্যান্য পেশায় আছেন তাঁরা বলতে পারবেন তাঁদের কী করণীয়।

আজকের দিনে, একজন চিকিৎসক হিসাবে আমার যা করণীয় তা হচ্ছে :

১) রোগীকে যত্নসহকারে দেখা। রোগ যত ছোটই হোক রোগীকে মনযোগ দিয়ে দেখলে এবং যথ আশ্বস্ত করলে রোগী অনেক নিশ্চিন্ত বোধ করেন। এই ছোট কাজটাই আমাদের নিষ্ঠা সহকারে করা উচিৎ। বিধান চন্দ্র রায়ের কথায় বলা যায়, অ্যালোপ্যাথি, হোমিওপ্যাথি সব কিছুর উপরে চাই সিমপ্যাথি।

২) মানুষ বিপন্ন হলেই আমাদের কাছে আসে, সেই বিপন্নতাকে ব্যবহার করে মুনাফা না করা। প্রাই প্র্যাকটিস ছাড়াও আজকাল কর্পোরেট বা বেসরকারী হাসপাতাল নার্সিংহোমগুলি ডাক্তারদের দিয়ে অন্যায্যভ মুনাফা অর্জন করে। শুধু অর্থের লোভে এই ফাঁদে ডাক্তার বা চিকিৎসাকর্মীদের পা দেওয়া উচিৎ নয়। মানু বিপন্নতা নিয়ে ব্যবসা করলে আমরাও নিকটজন কেউ অন্যের হাতে বিপন্ন হতে পারে।

৩) রোগের সামাজিক কারণ আছে, সেগুলোকে আমাদের অনুধাবন করা উচিৎ। তেমনি রোগীরও সামাজি অবস্থান আছে, তাকে মাথায় রাখা দরকার। এগুলোকে মাথায় রাখলে অপ্রয়োজনীয় ইনভেস্টিগেশন করানো অথ অযথা ওষুধ লেখার প্রবণতা কমবে। ওষুধ লেখার ক্ষেত্রেও অহেতুক দামী ওষুধ লেখা বন্ধ হবে। এতে রোগী যেমন আর্থিক সুবিধা হবে, তেমনি রোগী তার ক্ষমতার মধ্যে চিকিৎসা পুরোপুরি করতে পারবে।

আমার চেতনায় ডাঃ হেনরি নর্মান বেথুনের ১২৫-তম জন্মদিন

অধ্যাপক (ডাঃ) জ্ঞানব্রত শীল,
সভাপতি, নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন এবং
সহ-সভাপতি, বেথুন ইন্সটিটিউট অফ জেরিয়াট্রিক্স রিসার্চ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার।

বিপুল জনগোষ্ঠির দারিদ্র্য ও সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত মানুষের সামনে উদাহরণ হিসাবে তুলে ধরার মাত্র একজন আদর্শ চিকিৎসকের নাম আমাদের কাছে রয়েছে - তিনি ডাঃ হেনরি নর্মান বেথুন। স্বল্প পরিসরে তাঁর বিষয়ে কিছু জানা এবং হয়তো অনেকের কাছে অজানা তথ্য তুলে ধরছি।

১। তাঁর জন্মদিন ৩ অথবা ৪ মার্চ তা নিয়ে মতান্তর রয়েছে। বেথুন ইন্সটিটিউট অফ জেরিয়াট্রিক্স রিসার্চ অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ৩ মার্চ তাঁর জন্মদিন পালন করেন। নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের দেয়ালপঞ্জীতে তা ৪ মার্চ। আমি উভয় সংস্থার সঙ্গেই যুক্ত।

২। তাঁর চেতনায় চিকিৎসক পিতামহের শক্তিশালী প্রভাব থাকায় তাঁর বাবা ও মায়ের ধর্মীয় প্রবণতাকে তিনি সহজে অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। বিপরীত ভাবে বলা যায় তাঁর ঠাকুরদাদা নিজের সন্তানকে প্রভাবিত করতে না পারলেও, নাতিকে এতটাই করতে পেরেছিলেন যে সে শৈশব থেকেই চিকিৎসক হবার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছিল।

৩। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তিনি রণক্ষেত্রে স্ট্রেচার বাহকের কাজ করেছেন এবং সে কাজ করবার সময় আহত হবার ফলে তাকে বাড়িতে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হয়। চীনের রণক্ষেত্রে শল্যচিকিৎসকের কাজ করতে করতে তিনি নিজেই নিজেকে আহত করেন এবং তখন কেউ তাঁকে কোথাও ফেরাতে পারেননি - তিনি শহীদ হন।

৪। বেথুন টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ডিগ্রি অর্জন করেই আবার রণক্ষেত্রে উপস্থিত হন-এবার রাজকীয় নৌবাহিনীর ডাক্তারের ভূমিকায়।

৫। শল্যচিকিৎসার কাজে ব্যবহারের জন্য তিনি ডজন খানেক যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করেন। এর মধ্যে তাঁর নামাঙ্কিত 'বেথুন রিব শীয়ার' এখনো বিখ্যাত।

৬। সোভিয়েত দেশে গিয়ে তিনি ১৯৩৫ সালে সেখানকার কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন - নিজের দেশে তখনো তিনি তা হননি বা পাননি, অবশ্য পরে তা পেয়েছিলেন।

৭। রণক্ষেত্রের আকর্ষণ আবার তাঁকে নিয়ে যায় স্পেনে, ফ্যাসিবিরোধী সশস্ত্র সংগ্রামের সৈনিক হিসাবে।

৮। স্পেনের রণক্ষেত্রেই ব্যবস্থা প্রবর্তনা বিজ্ঞানে তাঁর সর্বজনস্বীকৃত অনন্য আবিষ্কার ও অবদান -রণক্ষেত্রে প্রথম চলমান রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থা প্রবর্তন।

৯। বর্তমানে সারা বিশ্বে স্বীকৃত সবার জন্য স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবী কম্যুনিস্ট-দুনিয়ার বাইরে তিনিই প্রথম করেছিলেন ১৯৩৮ সালে ক্যানাডা সরকারের কাছে।

১০। চীন দেশে বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রবর্তন করার কৃতিত্ব বেথুনের।

১১। অবাক ঘটনা - তৎকালীন একজন শ্রেষ্ঠ শল্য-চিকিৎসক বেথুন গ্লাভস না পরে একজন চীনা সৈনিকের অপারেশন করতে গিয়ে নিজের আঙুল কেটে ফেলে অ্যান্টিবায়োটিক হীন যুগে সংক্রমণের ফলে মারা যান। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য ১৯২৮ সালে আলেকজান্ডার ফ্লেমিং প্রথম অ্যান্টিবায়োটিক পেনিসিলিন আবিষ্কার করলেও তার ব্যবহারিক প্রয়োগ জানা যায় ১৯৩৯ সালে এবং এই সর্বরোগহর ওষুধ বাজারে আসে ১৯৪৫ সালে এবং সে বছরেই পেনিসিলিন আবিষ্কারের জন্য ফ্লেমিং, ফ্লোরে ও চেইন সমবেতভাবে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। পরবর্তী সময়ে আরো অনেক অ্যান্টিবায়োটিক আবিষ্কৃত হয়েছে। ইতিমধ্যে নানা কারণে পেনিসিলিন সহ অনেকে জীবাণু বহু অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করেছে যার ফলে আমরা আবার আতঙ্কজনক ভয়াবহ অ্যান্টিবায়োটিক হীন যুগে পুনঃপ্রবেশ করছি।

১২। বেথুন সম্বন্ধে বিভিন্ন জনের মতামতঃ ক্যানাডার মেডিক্যাল হল অফ ফেম-এ লেখা রয়েছে 'ক্যানাডা বেথুনকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের এক বিস্ময়-প্রতিভা হিসাবে মনে রেখেছে, চীন তাঁকে একজন ঋষি বলে শ্রদ্ধা করে'। আমি তাঁকে অনুসরণের চেষ্টা করি আদর্শ আন্তর্জাতিকতাবাদী বিপ্লবী চিকিৎসক হিসাবে। পাশাপাশি সম্প্রতি ক্যানাডার এক জননেতার দাবী 'বেথুনকে মানবতাবাদী বলে ছাত্রদের শেখানো এক অতি-নাটকীয় ভাঁড়ামি এবং তা অবিলম্বে বন্ধ করা হোক'। টোরেন্টো স্টার পত্রিকায় শিরোনাম Dr. Norman Bethune : China's Hero, Canada's Traitor। কোলকাতাতেও আমাদের সংগঠনের সদস্যদের বাদ দিলে ডাঃ হেনরি নর্মান বেথুনের নাম অনেকেই শোনেননি, ডাঃ নর্মান বেথুন বললেও লোকে বেথুন কলেজের প্রতিষ্ঠাতার নাম কারো কারো মনে পড়ে। এদেশেও কেউ কেউ বলেছিলেন 'বেথুনের নামে কেন সংগঠনের নামকরণ হবে?' - পরে অবশ্য তাদের কেউ কেউ মত বদলেছেন। কেউ হয়তো এখনো বদলাননি। চিন্তার জগতে বর্তমান শূণ্যতার কালে আন্তর্জাতিকতাবাদ শব্দটি যা বেথুনের নামের সঙ্গে সমার্থক বলে মনে করি তা লুপ্তপ্রায়। আমার মত চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের স্মৃতির বাহকদের দায় থাকছে তাকে অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট থাকা। এদেশে বেথুনের নামে প্রথম সংগঠণ গড়ে তুলতে পেরে আমার সহযোগীদের সঙ্গে আমিও গৌরব অনুভব করি। সে কারণেই উদার

মনের মানুষ কমরেড বিমল চ্যাটার্জি তাঁর বিশ্বস্ত সূত্র থেকে আমার বিষয়ে খবর নিয়ে ও আমার দলিলপত্র (যা বেথুন ইনস্টিটিট্যুট অফ জেরিয়াট্রিকস-এর হার্ড-ডিস্কে সংরক্ষিত রয়েছে) যাচাই করে, আমাকে বর্জ্য-স্তূপ থেকে তুলে এনে তাঁর পাশে বসিয়েছেন।

১৩। ক্যানাডা সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি মিউজিয়ামের 'হল অফ ফেম' - এ নিজের জবানীতে লেখা বেথুনের জীবনী: 'আমি যখন ডাক্তার হয়েছিলাম তখন ক্যানাডায় চিকিৎসায় সামাজিক দিক বিষয়ে কোনো ধ্যান-ধারণা ছিল না। বিপুল মন্দার ফলে সীমাহীন দারিদ্র্য। গরীব মানুষের চিকিৎসা হতো না। কেবল ধনীরাই ডাক্তারএর সেবা পেতো। ডাক্তার হিসাবে মানুষকে বাঁচানো আমার কাজ। তাই আমাকে অসুখের সামাজিক কারণ খুঁজতে হয়, বিচলিত হতে হয় ওষুধ ও চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে। আমি মন্ট্রীয়লে বক্ষরোগ বিশেষজ্ঞ সার্জন হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলাম কিন্তু প্রচলিত চিকিৎসা ব্যবস্থা সম্পর্কে আমি ছিলাম হতাশ। আমি সার্জারির কিছু যন্ত্রপাতি ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছি, বেকার ও গরীবদের জন্য ফ্রী মেডিক্যাল ক্লিনিক তৈরী করেছি, চিকিৎসা ব্যবস্থার সামাজিকীকরণের জন্য আন্দোলন করেছি এবং কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছি। ১৯৩৬ সালে স্পেনে গৃহযুদ্ধ শুরু হলে স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে যোগ দিয়েছিলাম ফ্যাসিস্তদের পরাস্ত করতে। রণক্ষেত্রে রক্ত দিতে না পারায় বহু সৈনিক মারা যাচ্ছিলো-আমি একটি চলমান রক্তদান ব্যবস্থা চালু করলাম, আহতদের কাছে রক্তপৌঁছে দিলাম, বহু জীবন বাঁচানো গেলো - আমার এই আবিষ্কার এখন সর্বজন স্বীকৃত পদ্ধতিরূপে প্রচলিত। ১৯৩০ সালে জাপান চীন আক্রমণ করায় আমি বিচলিত হই এবং ১৯৩৮ সালে চীনে যাই। সেখানে দুরুহ পরিস্থিতিতে প্রাথমিক চিকিৎসা, চিকিৎসা সেবা, ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হয় প্রচন্ড অসুবিধার মধ্যে। ওষুধপত্রের যোগাড় করা বেশ কষ্টকর ছিল। গ্লাভস ছাড়া অপারেশন করতে গিয়ে আমার আঙুল কেটে যায় ও সেই ক্ষত থেকে রক্ত দূষণ হয়ে আমি ১৯৩৯ সালে মারা যাই'।

১৪. বেথুনের চিন্তার-ভাবনার সঙ্গে আমরা যারা একাত্মতা অনুভব করি তাদের কোনো দেশ নেই, তারা যাযাবরের জীবন ভালোবাসে। সারা বিশ্ব আমাদের মাতৃভূমি - আমরা আন্তর্জাতিকতাবাদী। ধর্মীয় মৌলবাদ দাঙ্গার বীভৎসতা সৃষ্টি করে, তাই বুঝি 'ধর্ম জনগনের আফিম' তাই আমাদের ধর্ম নেই; নেই কোনো কুসংস্কার। আমরা ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে সততার সঙ্গে সোচ্চার থাকতে চেষ্টা করি। নিজ জীবনে আমি চরম দারিদ্র থেকে উঠে আসা মানুষ, আমি জানি বেথুন বারবার বলেছেন দারিদ্র্যের সঙ্গে অসুখের নিবিড় যোগাযোগের কথা, সমাজ ব্যবস্থা বদলের কথা। তাই দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা বেথুন অনুগামীদের অবশ্য কর্তব্য। বেথুনের মত আমিও দাবী করি আমি চাকুরীতে বেতন নিয়েছি, চাকুরীর বাইরেও রুগীর চিকিৎসা করি ও পরামর্শ দিয়ে থাকি, কিন্তু কারো কাছ থেকে অদ্যাবধি ডাক্তারি সেবার বিনিময়ে কোনো অর্থ নিইনি। এসবই বেথুনের ভাবাদর্শে দীক্ষিতদের কাছে সবার প্রত্যাশা থাকবে। বেথুনের জন্মদিনে আমরা তাঁর জীবন থেকে নেওয়া শিক্ষাগুলি আবার মনে করি।

কুষ্ঠ নিয়ে কিছু কথা

রামরমণ ভট্টাচার্য

৩০শে জানুয়ারি ভারতবর্ষে কুষ্ঠ প্রতিরোধী দিবস হিসেবে পালিত হয়। বিভিন্ন সমাজসেবী সংগঠন, কেন্দ্র ও রাজ্যসরকার গুলির পক্ষ থেকে দিনটি উদযাপিত হয় নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। ৩০শে জানুয়ারি তারিখটির একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই দিন গান্ধীজিকে হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যু দিবস হিসাবে নয় স্মরণ করা হয় কুষ্ঠরোগ নিবারণের জন্য গান্ধীজির একনিষ্ঠ সংগ্রামের জন্য। সবরমতী আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কুষ্ঠরোগীদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার ও সেবা করার জন্য।

কুষ্ঠরোগ সম্পর্কে আমাদের সমাজে ভয়ংকর কুসংস্কার আছে। ভারতবর্ষে এটা কেবল শারীরিক ব্যাধি নয় একটি অতি কুৎসিত সামাজিক ব্যাধিও বটে। এ রোগে আক্রান্ত রুগী কষ্ট পায় একই সঙ্গে তার পরিবার পরিজন সকলকেই ভুগতে হয় সামাজিক অত্যাচারের কারণে। রোগ সম্পর্কে অনেক ভুল ও মিথ্যা ধারণা আছে। কুষ্ঠ হয় ভগবানের অভিশাপে, গত জন্মের পাপের ফলে, কুষ্ঠ কখনো সারে না ইত্যাদি। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে সমগ্র পরিবার সামাজিক ভাবে একঘরে হয়ে যায়। অসহায়, হতভাগ্য রোগাক্রান্ত ব্যক্তি আত্মহত্যা করে অথবা নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। এই কুসংস্কার জগদ্দল পাথরের মতো নিষ্পেষণ করছে আমাদের সমাজকে চেতনাকে।

অথচ রোগটি নিতান্তই জীবানু ঘটিত। Mycobacterium laprac নামক একটি ব্যাকটেরিয়া এই রোগ শরীরে প্রবেশ করে রোগ সৃষ্টি করে। বিজ্ঞানীরা বলেন জীবানুটি টি বি রোগের জীবানুর জ্ঞাতি ভাই। আধুনিক MDT (মালটি ড্রাগ থেরাপি) এর সাহায্যে রুগীকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলা সম্ভব। তবে একটু সময় বেশি লাগে।

কুষ্ঠ, কলেরা, বসন্ত, টি.বি. ইত্যাদি রোগের মত তীব্র ছোঁয়াচে নয়। রুগীকে স্পর্শ করলে কেউ আক্রান্ত হয় না। কুসংস্কার, অশিক্ষা, সচেতনতার অভাব এই সব নানা কারণে আমাদের দেশে কুষ্ঠ এত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা সব থেকে বেশি। ২০১২ তে ২৩২৮৫৭ জন আক্রান্ত রোগীর মধ্যে ৫৮ শতাংশ ভারতবাসী, ২০১২-১৩ তে, নতুন ভাবে আক্রান্তের সংখ্যা ১৩৪৭৫২ জন। ভারতবর্ষে প্রতি ঘন্টায় আক্রান্তের বৃদ্ধি ঘটছে ১৫ জন করে অর্থাৎ বছরে ১৩৪০০০ এর বেশি। এর মধ্যে শিশুর সংখ্যা ১৩৩৮৭। অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের কথা রোগাক্রান্ত যে সব শিশুরা চিকিৎসার জন্য তাদের মধ্যে ৩৮ শতাংশ এর অঙ্গহানি ঘটে গেছে। অর্থাৎ আক্রমণ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌছে গেছে। ভারতের পরেই কুষ্ঠ রুগীর সংখ্যা বেশি ব্রাজিলে ৩৩৩০৩ জন। চিনের জনসংখ্যা আমাদের থেকে অনেক বেশি তবু কুষ্ঠ রোগে আক্রান্তের সংখ্যা যেখানে মাত্র ২০০০ জন। এই সংখ্যা প্রতি বছর কমছে। উন্নত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপ প্রভৃতি দেশে কুষ্ঠরোগী নেই বললেই চলে। অন্যদিকে আফ্রিকার গরীব দেশগুলিতে কুষ্ঠরোগীর সংখ্যা যথেষ্ট বেশি। এই সব তথ্য প্রমাণ করে দারিদ্রে ও অশিক্ষা কুষ্ঠের সঙ্গে রক্ত মাংসের মতো মিশে আছে।

কুষ্ঠ রোগের প্রাথমিক আক্রমণ অনেক সময় দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। শরীরের যে কোন স্থান গোলাকৃতিতে লাল হয়ে ফুলে ওঠে সঙ্গে জ্বর থাকে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটাকে চর্মরোগ ভেবে উপেক্ষা করা হয়। কয়েক দিনের মধ্যে জ্বর সেরে যায়, লাল দাগও মিলিয়ে যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণ ঘটে অনেক পরে। কখনো বৎসরাধিক কাল পরেও

প্রকাশ পায়। প্রধানত হাত পা এবং মুখমন্ডল আক্রান্ত হয়। আঙুল অবশ হয়ে যায় জ্বালা যন্ত্রণাহীন গলিত ক্ষত সৃষ্টি হতে থাকে। কখনো বা চোখ গলিত আকারে ঠিকরে বেরিয়ে আসে, দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে যায়। একটু সচেতন থাকলে আক্রমণের প্রথমেই একে চিহ্নিত করা যায়। ত্বকের লাল অংশে কোন স্পর্শানুভূতি থাকে না। স্নায়ুতন্ত্র অবশ হয়ে যাওয়া কুষ্ঠরোগের সাধারণ লক্ষণ।

চিকিৎসার কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। এ রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা প্রকৃতি আমাদের দিয়েছে। মাত্র ৫ শতাংশ মানুষের প্রতিরোধ ক্ষমতা নানা কারণে দুর্বল হয়। প্রথম পর্যায়ে রোগ ধরা গেলে সামান্য চিকিৎসাতেই সারিয়ে তোলা যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণের পরেও দেহকে সম্পূর্ণ জীবাণু মুক্ত করা সম্ভব। তবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গুরুতর হানি ঘটলে যে সমস্যার সমাধান প্রায় অসম্ভব হয়ে ওঠে।

আক্রান্ত রুগীর চিকিৎসার সঙ্গে একান্ত প্রয়োজন ভালো পথ্য, মায়া মমতা, সামাজিক সহযোগিতা ইত্যাদি যা তার আত্মবিশ্বাসকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। অথচ আমাদের সমাজে ঘটে তার বিপরীত আচরণ। এমন কি আমাদের রাষ্ট্রের ভূমিকাও এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। ব্রিটিশ আমল থেকে প্রচলিত আছে যে সব আইন কুষ্ঠ রোগের বিরুদ্ধে নয় রুগীর বিরুদ্ধে চরম দায়িত্বহীনতা এবং নিষ্ঠুরতা বলে বিবেচিত হতে পারে। ভারতবর্ষে কুষ্ঠরোগীর অধিকার নেই রেলগাড়িতে ওঠার, ভ্রমণ করবার, সকলের সঙ্গে পংক্তি ভোজনের, জমসমাবেশে উপস্থিত থাকার। স্বামী বা স্ত্রী যে কেউ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হলে অন্যজন তার বিরুদ্ধে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা দায়ের করতে পারে আদালতে-এই ধরনের অন্তত ১৫টি আইন যা পাশবিক এবং মর্মান্তিক।

এইসব অন্ধকার দিক যেমন আছে তেমনি উজ্জ্বল দিকও আছে যা কুষ্ঠরোগ প্রতিরোধের পথে আমাদের আলো দেখায়। অমানবিক আইনগুলি তুলে দেবার জন্য প্রবল প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছেন অনেকে। লোকসভায় আলোচনা হয়েছে বিভিন্ন সমাজসেবী প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ জমা পড়েছে। ২০১৩ এর ৩০শে জানুয়ারী কুষ্ঠ বিরোধী দিবস উদ্‌যাপনের সময় 'দি লেপ্রসি মিশন ট্রাস্ট' ইন্ডিয়া এর পক্ষ থেকে দাবী করা হয়েছে ...These laws need to be amended at the earliest to protect and promote the human rights of people affected by leprosy'। ভরসার কথা বেশ কিছু রাজ্যে এবং কেন্দ্রীয়ভাবেও কয়েকটি আইন সংশোধিত হয়েছে।

দি লেপ্রসি মিশন ট্রাস্ট ইন্ডিয়া (TLMTI) এর পক্ষ থেকে প্রচার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে বলা হয়েছে ঃ কুষ্ঠ একটি ব্যাধি, ব্যাধি দাবী করে চিকিৎসা এবং সামাজিক সহযোগিতা - ঘৃণা বা উপেক্ষা কিছুতেই নয়।'

আমাদের দাবী হোক কুষ্ঠ সম্পর্কে যে অপবিশ্বাস আমাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে তাকে সর্বশক্তি দিয়ে নির্মূল করতে হবে - কুষ্ঠ মুক্ত ভারত গড়ে তুলতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দের বহুমুখী প্রতিভা

জয়ন্ত ভট্টাচার্য,

ভারতবর্ষের ইতিহাস উনবিংশ শতকের অবদান কোনোদিন ভুলবে না। উনবিংশ শতক ভারতবর্ষকে যত কৃতী সন্তান দিয়েছে, অন্য কোনো যুগই ভারতবর্ষকে ক্রমান্বয়ে এত সু-সন্তান দেয়নি। সমস্ত সন্তানই সু-সন্তান। কিন্তু তাঁদের মধ্যে যাঁরা নিজেদের কাজ দিয়ে, দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রভাব ফেলে যান পরবর্তী প্রজন্মের ওপর, তাঁদেরই আমরা বলে থাকি কৃতী।

উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে যেসব ব্যক্তিত্ব ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই বিংশ শতকের প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত বেঁচেছিলেন এবং ভারতবর্ষকে দিয়ে গেছেন অনেক কিছু। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করা মনিষীদের মধ্যে তিনজনের নাম ভারতবর্ষের মানুষের জীবনশৈলীর সঙ্গে এমনভাবে মিলেমিশে গেছে যে তা কোনোভাবেই মুছে যাবার নয়। এই তিনজন মানুষ হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, স্বামী বিবেকানন্দ মহাত্মা গান্ধী। বলা হয়ে থাকে যে, ভারতীয়রা বিদেশে গেলে, এই তিনজন মানুষের দেশের লোক বলেই পরিচিতি লাভ করেন। এটা ভারতীয়দের গর্বের বিষয়।

এই তিনজনের মধ্যে একজন — গান্ধীজি যদিও মূলত রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনত ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন, ভারতীয় ভাবধারা এবং জাতীয়তাবাদেও তাঁর ভূমিকা অগ্রগণ্য। অপর দুইজন অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সমমনভাবাপন্ন, অর্থাৎ, দুজনই বিশ্বাস করতেন উপনিষদ ভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায়। দুজনেরই ছিল উপনিষদ এর ওপর অগাধ শ্রদ্ধা। উপনিষদ - এর শেষ কথা হচ্ছে মানুষ রবীন্দ্রনাথ, স্বামীজি আর গান্ধীজি, তিনজনেই বিশ্বাস করতেন যে সবকিছুর ওপরেই মানুষ, আর মানুষের ওপর কিছুই হয় না। এই তিনজনই ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারি। তিনজনের মধ্যে দুজন, রবীন্দ্রনাথ আর গান্ধীজি ছিলেন দীর্ঘায়ু। দুইজনই ছিলেন গৃহী। একজন কল্পনা জগতের কবি আর একজন বাস্তব ভারতবর্ষের প্রত্যেকটি মানুষের জীবন্ত ঈশ্বর।

আর তৃতীয় জন? স্বামী বিবেকানন্দ। চিন্তা-ভাবনায় অপর দুজনের সঙ্গে একমত। মানুষ আর স্বদেশ। এ বাইরে কিছুই থাকতে পারে না। কিন্তু তিনি তো সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। এমনিতেই আমরা জানি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর থাকেন জনারণ্যের বাইরে — কোনো একান্ত স্থানে ধ্যানমগ্ন — ভগবৎ চিন্তায়।

কিন্ত, এ কি ধরনের সন্ন্যাসী, যিনি মানুষের সঙ্গে মিশতেন, কাজ করতেন, লিখতেন, স্বদেশ চিন্তা করতেন গান গাইতেন, আরও কত কি! ভাবতেও অবাক লাগে, তিনি পৃথিবীতে চল্লিশ বছরও বাঁচলেন না। আগের উল্লে করা দুজন মানুষের তুলনায় বেঁচে ছিলেন প্রায় অর্ধেক সময়। আর কাজের সময় পেয়েছিলেন মোটামুটি দশ বছর এত কাজ তিনি করলেন কখন? সারাটা ভারতবর্ষ ঘুরে বেড়িয়েছেন, আর বিদেশে পাড়ি লাগিয়েছেন এমন একটি যুগে, যখন রক্ষণশীল ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় বিদেশ ভ্রমণকে অনাচার বলেই ধরা হত।

বিশ্বনাথ দত্তের দামাল ছেলে বিলে কীভাবে কর্মযোগী স্বামী বিবেকানন্দ হয়ে গেল, চিন্তা করা যায় ন তাও উনচল্লিশ বছর, পাঁচ মাস চল্লিশ দিনের মধ্যে। আসলে বিলে নামটাও তিনি পেয়েছিলেন বীরেশ্বর থেকে।

ভুবনেশ্বরী কাশীর বীরেশ্বর শিবের কাছে প্রার্থনা করে যে পুত্র সন্তান লাভ করেন, তার নাম তিনি দেন বীরেশ্বর। ক্রমে বীরেশ্বর থেকে সবাই তাঁকে ডাকতে শুরু করেন 'বিলে' বলে। অবশ্য, তাঁর পোশাকি নাম থেকে যায় নরেন্দ্রনাথ — তার থেকে নরেন। ঠাকুরও তাঁকে 'নরেন' বলেই ডাকতেন।

শৈশব থেকেই নরেন ছিলেন মানব প্রেমী। সুপুরুষ নরেনকে সবাই জানত সাহসী, স্বাধীনচেতা আর তীক্ষ্ণবুদ্ধি সম্পন্ন বলে। এছাড়া, ছেলেবেলা থেকেই তিনি ছিলেন একটু আধ্যাত্মিক চিন্তার মানুষ। সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল। ছাত্রাবস্থাতে তিনি স্কুলের নানা ধরনের আলোচনা ও বিতর্কে অংশগ্রহণ করতেন। নিয়মিত নাটকে অংশগ্রহণ ও অভিনয় করেও নরেন্দ্রনাথ যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। এছাড়া পড়াশুনাতেও তিনি ছিলেন সমান পারদর্শী। অবশ্য স্বাস্থ্যের কারণে তাঁর ছাত্র জীবনের এক সময়ে তাঁকে কিছু বিভ্রান্তির সম্মুখীন হতে হয়।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় নরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী হয়েছেন। একটা সময়ে নরেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মসমাজে সু-গায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন। ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণকে নরেন মুগ্ধ করেন তাঁর গান শুনিয়ে। রবীন্দ্রনাথের গানও তিনি গাইতে খুব ভালোবাসতেন।

নরেন্দ্রনাথ যে বাগ্মী ছিলেন এবং তাঁর বাচনভঙ্গী দিয়ে সবাইকে মুগ্ধ করতে পারতেন, সে বিষয়ে তো কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই, কারণ সারা বিশ্ব নরেন্দ্রনাথ দত্ত তথা স্বামী বিবেকানন্দকে চিনতে পারে মূলত তাঁর শিকাগো বক্তৃতার পর। যদিও এর আগে ভারতবর্ষের নানা জায়গায় তিনি যথার্থ সন্ন্যাসী এবং সুবক্তা হিসাবে নাম পেয়েছিলেন। আধুনিক ভারতবর্ষে আন্তর্জাতিকতাবাদের শুরু বোধহয় স্বামী বিবেকানন্দ থেকেই। অবশ্য, এর পরে বিশ্বের অন্যান্য অংশে স্বামীজির বর্ক্তৃতা এবং সেই বর্ক্তৃতার মাধ্যমে মানুষকে মুগ্ধ করার ঘটনা সু-বিদিত। একবার বিদেশযাত্রায়, তাঁর সফর সঙ্গী জামশেদজি টাটাকে তিনি পরামর্শ দেন ভারতবর্ষে ইস্পাত শিল্পের ভবিষ্যত সম্বন্ধে। আজকের ভারতবর্ষের ইস্পাত শিল্প কোথায় চলে গেছে, তা আমরা সবাই জানি।

একজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী কতখানি বাস্তব হতে পারেন, তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি প্রমাণ করে দিয়েছেন যুব সমাজই হচ্ছে মানুষের মূল শক্তি। যুব সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে না পারলে সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। একজন সন্ন্যাসী হয়ে স্বামী বিবেকানন্দ প্রথম ভারতবর্ষের যুব সমাজকে উদ্দেশ্য করে বলেন, যদি ঈশ্বর লাভ করতে হয়, কাশী, গয়া, বৃন্দাবন না গিয়ে মাঠে গিয়ে ফুটবল খেল। স্বামীজি জানতেন সমস্ত রকম কাজের মূল উৎস হল স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্য না থাকলে মন ভালো থাকে না, আর মন ভাল না থাকলে কোনো কাজই সু-সম্পন্ন হয় না। দেশের কাজ করতে হলে মন চাই, মনকে সজীব রাখতে স্বাস্থ্য চাই। স্বামীজির শিক্ষা চিন্তার আর একটা দিক হচ্ছে শারীর বিদ্যা। স্বামীজি প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশনের স্কুলগুলিতে শরীর চর্চা দৈনন্দিন সারণীর মধ্যে পড়ে এবং আবশ্যিক।

স্বামীজির শিক্ষা চিন্তার আরও একটা দিক হচ্ছে নারী শিক্ষা। স্বামীজির প্রথম শিক্ষা লাভ হয় তাঁর মায়ের কাছে। বলা বাহুল্য, তাঁর প্রথম ইংরেজি শিক্ষা তাঁর মায়ের কাছেই। স্বামীজি বিশ্বাস করতেন মায়েদের শিক্ষিত না করলে কোনো সমাজ উন্নতি করতে পারে না। একজন পুরুষ শিক্ষিত হলে সমাজ একজন শিক্ষিত ব্যক্তি পায়। কিন্তু একজন নারী শিক্ষিত হলে একটা সমাজ শিক্ষিত হয়। উনবিংশ শতকের রক্ষণশীল ভারতীয় তথা বাঙালি সমাজে মহিলারাও যে পড়াশুনা করতে পারে, শিক্ষা লাভ করতে পারে, তা প্রথম প্রমাণ করলেন স্বামী বিবেকানন্দ, যার পূর্ণতা প্রাপ্তি হল পরবর্তীকালে ভগিনী নিবেদিতার কাজের মধ্য দিয়ে।

স্বামী বিবেকানন্দের জীবন সর্ব যুগে, বিশেষ করে এখানকার প্রায় নৈরাজ্যের পরিস্থিতিতে সমাধানের প্রতীক। একটা মানুষ অল্প সময়ে কি করতে পারে, তা স্বামীজিকে না জানলে বোঝা সম্ভব নয়। আমরা সাধারণভাবে স্বামীজিকে একজন ধর্মীয় মানুষ বলে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করি। কিন্তু ভালোভাবে বিচার করলে আমরা দেখতে পাব আমাদের যে ধর্মের পরিভাষা, তার ধারেকাছে তিনি ঘেঁষেননি। স্বামীজির চিন্তায় ধর্ম হচ্ছে মানুষের অন্তরের কথা। প্রত্যেক মানুষই কোনো না কোনো একটা মূল্যবোধ বা বিচার-বুদ্ধি নিয়ে বড় হয়। এই বিচার বুদ্ধির বাইরে সে যেতে পারে না। পরিবেশ মানুষকে এই বিচার - বুদ্ধির পরিবর্ধন ও পরিমার্জনা করতে সাহায্য করে। একটা বয়সে এসে মানুষ কোনো একটা প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এই বিচার-বুদ্ধির সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই, তবে সমাজের সম্পর্ক আছে। প্রত্যেক মানুষের চিন্তাধারার মধ্যে তার সমাজ এবং পরিবারের চিন্তাধারার প্রভাব থাকে। এই প্রভাবকে আমরা অনেক সময় ধর্মীয় বিশ্বাস বলে থাকি। তবে স্বামীজির মতে প্রত্যেক মানুষের ভেতর ব্রহ্মত্ব লুকিয়ে আছে। ধর্ম এই ব্রহ্মত্ব প্রকাশ করে মানুষকে পূর্ণতার পথে এগিয়ে নিয়ে যায়। সুতরাং ধর্মকে জীবন থেকে আলাদা করে কতগুলো রীতি-নীতির ভেতর বেঁধে রাখলে চলবে না, তাকে প্রকাশ করে উন্মুক্ত করে দিতে হবে। সে নিজেই তখন ব্যক্তিকে সর্বদা তার সঠিক পথ বলে দেবে, সিদ্ধান্ত বলে দেবে। এই অবস্থাকেই আমরা বলে থাকি সিদ্ধিলাভ।

জীব মাত্রেরই পৃথিবীতে আসা এখন থেকে চলে যাবার জন্য। কোনো প্রাণীই এই গ্রহে অনন্তকালের জন্য আসেন না। ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, জীবনে দাগ রেখে যাও।

স্বামীজি তাঁর গুরুর এই বাণী অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। চল্লিশ বছরের কম সময় এই মাটির পৃথিবীতে বাস করে যা কাজ করে গেছেন, আমরা সাধারণ মানুষ তা কল্পনাও করতে পারব না। তার থেকেও আশ্চর্য লাগে তিনি সম্পূর্ণ কাজের সময় পেয়েছিলেন মোটামুটি সাত থেকে আট বছর। এই সময়ের মধ্যেই তিনি সারা পৃথিবীকে পরিচয় করিয়েছিলেন ভারতবর্ষের সঙ্গে। সারা পৃথিবীর ধারণার পরিবর্তন করিয়ে দিয়েছিলেন ভারতবর্ষ সম্বন্ধে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই রমা রোলাঁকে বলেছিলেন, ভারতবর্ষকে জানতে হলে বিবেকানন্দকে জানো। — স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন ভারতবর্ষের প্রতীক। এত গভীরভাবে নিজের জন্মভূমিকে ভালোবাসার দৃষ্টান্ত বোধহয় পৃথিবীতে বিরল। একজন সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে, দেশের প্রতি এবং দেশমাতৃকার প্রতি এত আনুগত্য একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দের দ্বারাই সম্ভব।

বিভূ মুখার্জী'র কবিতা

মাতৃভাষা

জন্মেই মোরা 'মা' বলে ডাকি
বাংলা ভাষায় দিওনা ফাঁকি,
রক্ত দিয়ে মাতৃভাষা পেয়েছি
একুশে ফেব্রুয়ারী শপথ নিয়েছি।

ব্যক্ত

মাতৃভাষা মনের ভাষা
আপন ভাষা ভাই,
স্মৃতিভরা বেদনা তাই
ব্যক্ত করা চাই।

আলোর নিশানা

অন্ধকার হ'তে আলোর নিশানা পাই
জন্মেই 'মা' বলে সম্বোধন করি
চড়াই-উত্‌রাই পেরোতে থাকি
তোমারি পথ বেয়ে; আদি অনন্তকাল থেকে
যা চিরন্তন সত্য —
তোমারি হাত ধরে হাঁটি হাঁটি পা-পা
সেই যে ভাষাতে কথা বলি,
আঁকা-বাঁকা কঠিন পথ চলি;
শৈশব-কৈশোর-যৌবন-বার্ধক্যতে
জীবনের অমোঘ নিয়মে —
পড়ি-মরি মানুষের জন্য গান করি
ভাষা শহীদের রক্তের বিনিময়ে, রক্তাক্ত পথেই
স্বীকৃতি পেয়েছে আমাদের প্রিয় বাংলা ভাষা
আমাদের সকলের মাতৃভাষা।

বর্ণপরিচয়

ছোট্টবেলার চড়ুইভাতি
খেলা করি দিবা-রাতি।
বর্ণপরিচয় লেখাপড়ার ছবি
মাতৃভাষায় লিখবে ছড়া কবি।

ভাষা শহীদ

ব্রিটিশ শাসনের অবিভক্ত ভারত থেকে
স্বাধীন ভারতের বিভক্ত ভারতে ও ভাষার
উপর আক্রমণ চলছেই;
বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের কথা শুনে —
স্বাধীন ভারতের প্রদেশে-প্রদেশে গিয়ে
কথা বলতেই দেখি একাংশ মানুষ
উপেক্ষার ভঙ্গিমা করে তাকিয়ে থাকে —
মান-হুঁশ নামক দুপায়া জন্তুরা।
ভারত-পাকিস্তান হওয়ার পর বাংলাদেশের
দাবিতে রোশেনারাসহ শত-সহস্র শহীদের
রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন বাংলার জন্ম হয়েছে।
বাংলা ভাষার দাবিতে রফিক-জব্বর
আবদুল-সালামের শহীদের রক্ত ঝরেছে।
জন্মেই মোরা সেই বাংলা ভাষাতেই —
'মা' বলে ডাকি, খেলা করি —
গান করি; তাইতো সকলেই বলি,
আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারী — সেকথা কি
আমি কখনো ভুলিতে পারি?

একটি বিচিত্র আনন্দ ও দুঃখজনক অভিজ্ঞতা

শ্রীমতী ছায়া মুখার্জী

আমি একজন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা। মনের সুপ্ত বাসনা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আমাকে তাড়া করে বেড়ায়, নিজের দেশ এবং পার্শ্ববর্তী দেশ ও ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্য এমনকী পশ্চিমবঙ্গের সবকটি জেলার ভৌগলিক চিত্র ও মানুষের জীবনযাত্রার ধারার সাথে নিজেকে সংপৃক্ত করার সাধ, কিন্তু বাদ সাধে সময় এবং অর্থ। কর্মজীবনে দিনের প্রায় বারো ঘন্টা সময়ই বিদ্যালয়ের পিছনে অতিবাহিত হত। কাজেই কোথাও ছুটে চলে যাওয়াটা ছিল অলীক স্বপ্ন। মাসিক উপার্জনের অর্থটাও যথেষ্ট কম। তাই অবসরের পরে স্থির করি দৈনন্দিন জীবনে কৃচ্ছসাধন করে মনের সাধ কিছুটা পূরণ করবো। 'বড়ো সাধ জাগে একবার তোমায় দেখি'। তাই জননী জন্মভূমিশ্চ: স্বর্গাদপী গড়িয়সি ... কে স্মরণ করে আমি ও আমার স্বামীর জন্মভিটা বাংলাদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম।

৫ই অক্টোবর, ২০১৩, শনিবার বেলা ৯টায় বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। আমাদের সঙ্গে ছিল আমাদের পারিবারিক বন্ধু অন্য আরেকজন। কথা ছিল তার সঙ্গে তাদের জন্মভূমি ময়মনসিং জেলায় যাবার। কিন্তু অগত্যা আমার স্বামী স্থির করলেন যে সামনে দূর্গাপূজা এবং ঈদ উৎসব থাকায় বিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যাবে তাহলে আর বিদ্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করা যাবে না। এই বিদ্যালয়ের সাথে নিজের বাবার নাম নিজের ও অগ্রজদের স্মৃতি বিজড়িত হয়ে আছে। সুতরাং আমাদের প্রথম গন্তব্য স্থলটি হল বিক্রমপুরের ইছাপুরা উচ্চবিদ্যালয় এবং ইছাপুরা গ্রাম।

পেট্রাপোল বর্ডার দিয়ে আমরা বাংলাদেশে প্রবেশ করি। পরদিন ভোর পৌনে চারটেয় ঢাকা পৌছে যাই। একটু বেলা হলে আমরা অটো এবং রিক্সা দরাদরী করে শেষ পর্যন্ত একটা রিক্সায় উঠলাম। সাইকেল রিক্সাগুলি বেশ ছোট ছোট। একটি ছেলে যথেষ্ট শ্রদ্ধার সাথে আমার স্বামীকে রিক্সায় তুলে দিয়ে রিক্সা ওয়ালাকে বলেছিল যে "আঙ্কেল ইন্ডিয়ান, ওনাকে সাবধানে ঠিক জায়গায় নামিয়ে দেবে ভাই"। রিক্সাওয়ালা টাকা বেশী দাবী করায় একই জায়গায় দুবার করে ঘুরপাক খাওয়ালো। সত্যি সত্যি বেশী টাকা চাইলো। আমরা দিয়ে দিলাম। আমরা যে বাস স্ট্যান্ডে এলাম তার নাম 'গুলিস্তানের বাসস্ট্যান্ড। ওখান থেকে বিভিন্ন জায়গার বাস ছাড়ে। আমরা যে বাসটি ইছাপুরা যাবে তাতে উঠে বসলাম, বাসটি একটু পরেই ছাড়বে, সামনেই দুটো সীট ছিল। বাসটি সকাল ৮টায় ছাড়লো। ঢাকা ছেড়ে বাস হু হু করে মুন্সিগঞ্জ জেলায় প্রবেশ করলো পথে অসংখ্য ব্রীজ ও সাঁকো পেরিয়ে বাস চলেছে। আর পাড়ে বিভিন্ন ভঙ্গীতে কাশ ফুল ফুটে আছে, কোনটা নৃত্যের ভঙ্গিতে এ ওর সাথে ভাব বিনিময় করছে। আবার কেউবা পেঁজা তুলার মতো আকাশের দিকে তাকিয়ে অট্টহাসি হাসছে। কেউ কেউ আবার অতি ম্লানরূপে বেদনাতুর মনে পরস্পর পরস্পরের সাথে মনের কথা ব্যক্ত করছে। একি প্রকৃতির রূপ দেখলাম! জলে মরাল-মরালী কেলি করছে। ছোট ডিঙিতে কেউ পারাপার হচ্ছে। কেউ বা মাছ ধরছে। ঝোপে ঝোপে রঙবেরঙের ফুল। কোথায় শালুক, শাপলা ফুল ফুটে আছে। আর আছে কচুরীপানা ফুল। নদীর বাঁকগুলিতে সবুজ ঘাস ও বড়

বড় বৃক্ষরাজী আহা! কী - অপূর্ব শোভা, এ ঠিক লেখায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। এ শুধু শিল্পীই পারে তার তুলির যাদুর টানে ভাব প্রকাশ করতে। গাছে শাখে শাখে শরতের আনন্দে কল-কাকলিতে মুখরিত হয়ে নানান সুরে নানাভঙ্গিতে চঞ্চলা বৃক্ষরাজ। তখন সমস্বরে গেয়ে উঠতে ইচ্ছা করে .. "আহা! কী আনন্দ আকাশে বাতাসে", এই প্রাকৃতিক শোভা অতিক্রম করে আমরা মুন্সিগঞ্জ বাজারে প্রবেশ করলাম। বেশ বড় বাজার। আধুনিক যাবতীয় জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে সেখানে। এর কিছুক্ষণ পরেই এল ইচ্ছাপুরা গ্রাম। আর একটু এগিয়ে ডানদিকে পড়েছে ইচ্ছাপুরা ইউনিয়ন পরিষদ ভবন। সেখান থেকে গ্রামের মানুষদের উন্নতিসাধনের নানাবিধ কাজের পরিকল্পনা ও তার বাস্তবায়ন করার কাজ চলছে। এছাড়া বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয়ের আন্দোলনের ইতিহাসের যোদ্ধাদের ছবি দৃশ্যমান বোর্ডে টাঙানো রয়েছে। পাশেই ক্রীড়া পর্ষদ ভবন নির্মিত হচ্ছে। সেখানে আমরা একটা ছোট্ট আবেদন রাখলাম অতিথিশালা নির্মাণের জন্য। পরিষদের চেয়ারম্যানের সাথে পরিচয় ঘটল। তিনি আমাদের আদর জানিয়ে দুটো ফল দিয়ে অর্ভ্যথনা জানালেন। আমরা ঐ গ্রামের মানুষদের আতিথেয়তায় ও আন্তরিকতায় অভিভূত। যেহেতু আমার স্বামী প্রথমেই ইচ্ছাপুরা বিদ্যালয়ে যাবেন কাজেই আমরা প্রথমেই পরিষদ ভবন থেকে এগিয়ে বাঁদিকের একটা ছোট্ট ব্রীজ পার হলাম তারপর ডানদিকে সোজা এগিয়ে রাস্তার বাঁদিকে বিশাল বড় স্কুল। বিশাল বড় খেলার মাঠ, সবুজ ঘাসে কার্পেট বিছানো। বিদ্যালয়ের গেটে প্রবেশ করলাম। কোন শিক্ষককেই চিনতাম না। কোনভাবে বাড়ীর অগ্রজের কাছ থেকে দুজন শিক্ষকের নাম শুনেছিলাম। তাদের দুজনের একজন ও ৬ই অক্টোবর, ২০১৩ বিদ্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন না একটি বিশেষ কারণে। আমরা পরিচয় দিলাম যে কলকাতা থেকে এসেছি আপনাদের সাথে দেখা করতে আর জন্মভূমি দেখতে। একজন মুসলিম সম্প্রদায়ের শিক্ষক সাথে সাথে বললেন অনেকদিন আগে আমি আপনাদের কালীঘাটের বাড়ী গিয়েছিলাম। সাদরে সকল শিক্ষক / শিক্ষয়েত্রী আমাদের বসালেন আর একজন শিক্ষক পরেশ চন্দ্র দাস সাথে জলখাবার আনালেন গরম গরম পরটা আলুর তরকারী সাথে সন্দেশ এবং চা। আমরা বেসিনে হাত মুখ ধুয়ে খাওয়া সেরে নিয়ে সকলের সাথে কথা বলতে না বলতে গ্রাম থেকে বিশিষ্ট লোকেরা চলে এসেছেন। তারা তাদের বাড়ীতে আমাদের নিয়ে গেলেন। বাড়ীটা রীতিমতো ফার্ম হাউস। দ্বিতীয়বার আপ্যায়ন শুরু। জার্মানীর স্ন্যাক্স ও অনেকগুলো কমলালেবু, আপেল। নানারকমের বিস্কুট প্লেটে সাজিয়ে দিলেন। ও নার চার ছেলেই বিদেশে চাকরি করেন। মেয়ে ও জামাই শিক্ষক-শিক্ষায়েত্রী। ওনারা আমাদের ওনার বাড়ীতে থাকতে বললেন। কিন্তু আমরা বললাম জন্মভিটা আগে দেখি তারপর দেখি কি করি? এরপর বাড়ীতে গেলাম অনেকটা জমি নিয়ে পুকুর নিয়ে রাস্তা ছোট-খাট আস্ত একটা গ্রাম বলা চলে। ভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের মতো ভাগ ভাগ করে বসবাস করছে। বাড়ীতে হাঁস-মুরগী, ছাগল-গরু ইত্যাদি প্রতিপালিত হচ্ছে। গাছ-গাছরায় ঘেরা পুরো বাড়ীটা। পুকুরে ছলাৎ ছলাৎ করে লাফিয়ে উঠছে মাছ। তাকিয়ে দেখলাম লেজটা ঘুরিয়ে জলের তলায় তলিয়ে গেল। অসংখ্য রঙবেরঙের প্রজাপতি উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। দুই-একটা শুঁয়োপোকা ও টুপটাপ করে এসে গায়ে পড়ে চলতে শুরু করেছে। যিনি আমাদের বাড়ীটা দেখাতে নিয়ে গেলেন, তিনি আমার স্বামীর দাদার বন্ধু, তাই ছোট বেলার সমস্ত ঘটনা বলতে লাগলেন। আমার শ্বশুর মশাই নাটক মঞ্চস্থ করতেন গ্রামের মানুষদের নিয়ে। সেখানে পরিবারের ছেলেমেয়েরাও অংশ গ্রহণ করতো। কলকাতা থেলে ডায়নামো নিয়ে গ্রামে আলো জ্বালাবার ব্যবস্থা করেছিলেন। ওনার ছোট ভাই-এর নাম সামসুদ্দিন আহমেদ।

সকলে ওনাকে জার্মানী সাহেব বলে ডাকে। কারণ তিনি ত্রিশ বছর ধরে রেফারি কাজে র্জামানীতে ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি ইছাপুরা বিদ্যালয়ের ক্রীড়া শিক্ষক পদে আছেন। গ্রামের ভিতর দিয়ে ইচ্ছাপুরা বাজারে নিয়ে গিয়ে এক মিষ্টির দোকানে রসগোল্লা, সন্দেশ ও দই সহযোগে ভোজন করালেন এবং বাজারের বিভিন্ন দোকানদারদের সম্বন্ধে নানা গল্প করতে লাগলেন। এর মধ্যে জার্মানী সাহেব, সুধীর কাসারু, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষক ওনারা আমাদের খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন। পথিমধ্যে তাদের সাথে দেখা হতেই তারা প্রত্যেকে আমাদের তাদের বাড়ীতে থাকার জন্য অনুরোধ জানালেন। আমরা শেষপর্যন্ত সুধীর বাবুর বাড়ীতে গিয়ে থাকলাম। তাদের আপ্যায়নে আমরা অভিভূত হয়ে গেলাম। আমরা ৮ই অক্টোবর, ২০১৩ বিকাল ৪টায় ইছাপুরা থেকে রওনা হয়ে ঢাকায় সুধীরবাবুর মেয়ের বাড়ীতে গেলাম। ওখানে ইলিশমাছ সহযোগে ভাত খেয়ে ঘুম দিলাম। সকালে ৫টায় উঠে রওনা দিলাম। মতিঝিলের দিকে রিক্সা একদম 'শ্যামলীর' কাউন্টারের কাছে পৌছে দিল। সাথে সাথে টিকিট কেটে বাস আসতে বাসে বসে পড়লাম। বাস খুব স্পীডে রওনা দিল। কিন্তু সমস্ত রাস্তাই জ্যাম এ আটকানো, ফলে বাস চেষ্টা করেও এগোতে পারলোনা। আমাদের পৌছানোর কথা ১১.৩০টায় আমরা সেখানে পৌছালাম তখন অন্ধকার। সব লোক নেমে গেছে, তখন সুপারভাইজার আমাদের শ্যামলীর নিজস্ব হোটেলে পৌছে দিল। হোটেলের চার্জটা একটু বেশী হলেও যথেষ্ট সুন্দর এবং পরিস্কার পরিচ্ছন্ন। কিছুই খাবার দাবার পাওয়া গেল না। অগত্যা গেটের কর্মচারী বললো যে সে ঘুমিয়ে পড়বে তাই কিছু আনতে হলে বলুন, আমি বাইরে থেকে এনে দেবো, ওকে টাকা দিলাম। ও খানিকটা ভাত-তরকারী, ডাল এনে দিল। আমরা হাত মুখ ধুয়ে ১২.৩০ টা নাগাদ তাই একটু খেয়ে শুয়ে পড়লাম। বেলা ১১টা নাগাদ চট্টগ্রামের বাসে রওনা দিলাম এবং সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ চট্টগ্রামের দামপাড়া পৌছে গেলাম। সেখানে চা-বিস্কুট খেয়ে ঢাকায় আসার জন্য বাসের টিকিট খুঁজতে লাগলাম। শেষ পর্যন্ত গ্রীণ লাইন বাসের টিকিট পেলাম। সে বাস রাত ১১টা নাগাদ রওনা দিল। ১৬ই অক্টোবর ঈদ উপলক্ষ্যে সারা রাস্তায় মোরে মোরে গরু-ছাগলের হাট চলছে। ফলে সমস্ত রাস্তাই জ্যাম। তবুও রাতের গাড়ীতে এলাম বলে একটু ফাঁকায় ফাঁকায় আসতে পেরেছি। সকাল ৬টায় আমরা মতিঝিলের গোলাপ বাগে নামলাম। রিক্সায় উঠে আমরা গুলিস্থানের কাছাকাছি 'ঢাকা হোটেল' এ উঠলাম। আমরা একটু আশেপাশের অঞ্চলটা দেখতে বেরিয়ে পড়লাম। আর সিদ্ধান্ত নিলাম বাইরেই খেয়ে হোটেলে ফিরবো। রাস্তায় বেরোতেই পথে একজন বলছে সামনেই 'জয়-কালীর' মন্দির এগিয়ে দেখে আসতে পারেন। আমরা এগোতে লাগলাম। পথে একজন লম্বা মানুষ আমার স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে বললো আপনার খুব বিপদ আছে। আমরা পাত্তা না দিয়ে এগোতে লাগলাম। খানিকটা এগিয়ে যাবার পরে আরও একজন এসে পথে দাঁড়িয়ে পড়ল এবং বললো 'ঐ লোকটা আপনার বিপদ আছে বললো তো, আমি বললাম হ্যাঁ, শুনুন ঐ লোকটা টাকা পয়সা নেন না ভালো মানুষ, আপনি ওনার কথাটা শুনে যান'। আমি বললাম কী বলে শোন না, আমরা দু-জনে একটু দুরে একটি ব্যাঙ্কের সিঁড়িতে দাঁড়ালাম, ঐ লোকটা আমাদের বাবা-মায়ের নাম জিজ্ঞাসা করলো তারপর বললো খুব বিপদ কিছু করার নেই। আমি বললাম তাহলে কী করতে হবে? সে বললো মন্দিরে বাবা-মায়ের নাম করে ধূপকাঠি ও মোমবাতি জ্বালিয়ে দিন। আমরা আর সময় নষ্ট না করে চলতে লাগলাম। তারপর একটু দূরে ওই মন্দিরে গেলাম, সেখানে একটু বিশ্রাম করলাম। সেখান থেকে বেড়িয়ে এসে একটা ফ্লাইওভার পেরিয়ে একটা দুর্গাপূজার প্যান্ডেলে

ছাদের উপর। সেদিন ছিল ষষ্ঠী। প্যাণ্ডেলে প্রতিমা এসেছে। তাছাড়া প্রচুর পুলিশ পাহারা আমরা দেখে এসে তারপর অনেকটা হেঁটে এসে অনেকবড় একটা হোটেল পেলাম, বেলা তখন ১.৩০-২টা হবে। মধ্যাহ্ন ভোজন সেরে হোটেলের দিকে রওনা দিলাম। বেলা ৪টে নাগাদ আবার আমরা বেড়িয়ে পড়লাম শাঁখারি বাজারের উদ্দেশ্যে। আমি বললাম এই হোটেলে না থেকে আমরা শাঁখারি বাজারে 'কল্পনা হোটেল' এ থাকবো। রিক্সা করে আমরা গেলাম শাঁখারি বাজারে। 'কল্পনা হোটেল' এ গিয়ে কথা বলে এলাম যে আগামী কাল আমরা থাকবো। রিক্সায় উঠে ডাবল ভাড়া দিয়ে ঢাকা হোটেল এ চলে এলাম। তখন থেকে আমার স্বামী অস্থির হয়ে উঠল আমি আর এখানে থাকবো না ইছাপুরা যাবো। কত বোঝালাম, কোন কথাই বুঝলনা। পরের দিন সকাল ৫টায় উঠে ছটফট করতে লাগলো এবং আমাকে তাড়াতাড়ি যাবার জন্য তাগাদা দিতে লাগলো। আমি বললাম ৮টার পরে যাবো, সে তখন বললো আমি একাই চলে যাবো। অগত্যা কী আর করা যাবে গুলিস্তান ওখান থেকে পায়ে হাঁটা পথ, আমরা মালপত্র নিয়ে গুলিস্তান বাস স্ট্যান্ডের দিকে রওনা দিলাম। সকাল ৬টায় রাস্তা ঘাট শূণশান। বাসস্ট্যান্ডে কোন বাস নেই। ফলে আমরা দু-জন দাঁড়িয়ে আছি। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে একজন মুসলিম সম্প্রদায়ের লোক একটা ব্রীফকেস নিয়ে এসে দাঁড়ালো। হঠাৎ আমার স্বামী বলে উঠলেন – 'ধুৎ, একটাও বাস নেই, বাস কখন আসবে কে জানে? উনি আমরা থেকে তিন হাত দূরে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট ধরালেন, লোকটিও ওনার সামনে পিছনে হাঁটছে, এবার আমার স্বামী বলে উঠলেন — 'কখন যে বাস আসবে কে জানে? এমন সময় লোকটি এগিয়ে ওনার মুখোমুখি হয়ে জিজ্ঞাসা করল ... ' আপনি জ্যাইবেন কোথায়?' উনি উত্তর দিলেন, 'আমি যাব আমার দেশের বাড়ী ইছাপুরা। আচ্ছা এখান থেকেই বাস ছাড়ে তাইনা? হুঁ, আমি তো জামু ওই খানেই' - লোকটি বলল। লোকটির কথায় একদম গ্রামের লোকের গন্ধ পাওয়ায় তিনি তারসাথে গল্পে আটকে গেলেন। আমার তো মনে মনে খুব রাগ হতে লাগল। কারণ সাত সকালে শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকা। এমন সময় উনি পকেট থেকে জার্মানী সাহেবের কার্ড বের করে দেখাতে লাগলেন। লোকটি তখন বলতে লাগল 'আরে ওনারে চিনুম না ক্যান? আমি ওনাকে খুব ই চিনি, কালকেই তো ওনার লগে একজায়গায় দেখা হইল। ইত্যাদি ইত্যাদি। এবার লোকটি পকেট থেকে মোবাইল বের করে মিছামিছি ফোন করে আমাদের শোনাতে লাগলো আরে এখান থেকে মনে হয় বাস ছাড়বে না, আমি 'যাত্রাবাড়ী' থেকে বাস ধরতে যাচ্ছি, আমার দেরী হইবে, বাড়িতে বইল্যা দিস। ফোন ছেড়ে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বললো চলেন - আপনারা যেখানে যাইবেন আ আ আমাগো বাড়ী ছাড়াইয়াই তো আমাগো বাড়ী, একলগেই চলেন। আমার স্বামীও তার সঙ্গে এগিয়ে যেতে লাগলেন। আমি অগত্যা পিছু পিছু হাঁটতে লাগলাম। দশ পা হেঁটেই রিক্সা স্ট্যান্ড। ওখানে যেতে গেলে রিক্সায় যেতেই হবে, আমার স্বামীকে একটা রিক্সায় উঠিয়ে একটু ব্যবধানে (দশ পা) অন্য আর একটি রিক্সাতে আমাকে তুললো। এবার আমার রিক্সায় আমার স্বামীর ব্যাগটা, লোকটির ব্রিফকেস দিয়ে দিল। এছাড়া আমার কাছে আর একটি কালো ব্যাগ ছিল ওর ভিতর সব দামী জিনিসপত্র, ক্যামেরা, মোবাইল টাকা পয়সাও ছিল। যাত্রাবাড়ী থানার কাছে রাস্তার মোড়ে আড়ালে একটা দোকানের পাশে ওদের রিক্সাটা এমনভাবে রাখলো যাতে আমি ভালোমত কিছুই দেখতে পারছিলাম না। লোকটি এসে আমাকে রিক্সা থেকে নেমে দাঁড়াতে বললো। আর আমার স্বামীকে ছয়টি রাস্তার মোড় মুহূর্তে পার করে দাঁড়

করিয়ে এসে আমাকে বললো আর একটি রিক্সায় উঠতে। আমি বললাম আমার স্বামী কোথায়? সে বললো 'ঐ তো সামনের রিক্সতেই যাইতেসেন তো। আমি সামনে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেলাম না। এবার রিক্সা বাসের গ্যারেজ, একটা ব্রীজ পার হয়ে ছুটতে লাগলো। প্রায় ৩০ মিনিট পথ এলাম। তারপর হঠাৎ একটা লোক এসে আমাদের রিক্সাটা থামালো। আমি আগের দুটি রিক্সার ভাড়া দিয়েছিলাম, এই রিক্সার ভাড়াও আমি দিলাম। লোকটি নিজের ব্রিফকেস, আমার লাগেজ সব নিজে নিয়ে হাঁটতে লাগলো আর আমাকে বললো আপনে তাড়াতাড়ি আসেন। আমি লোকটিকে আবার জিজ্ঞাসা করলাম আমার স্বামী কোথায়? বললো ... 'আরে চলেন না, সামনের গাড়িতে ওনারে বসাইয়া দিয়া আইতাছি। আমি তখন মনে মনে সম্পূর্ণ বুঝেগেছি যে কোন বাজে খপ্পরে পড়ে গিয়েছি। প্রায় মাইল দেড়েক পথ হাঁটালো এমনকি একটা মসজিদের ভিতর দিয়ে আমাকে মাথায় কাপড় ঢাকা দিয়ে নিয়ে এলো। এবার দেখলাম একটা গলির মুখে রিক্সা দাঁড় করানো। আমাকে তাতে তাড়াতাড়ি উঠতে বললো। আমি আবার জিজ্ঞাসা করলাম আমার স্বামী কোথায়? বললো আরে ওনারে ধইর‍্যা উঠাইতে হইবে।' আপনি চলেন আমার বাসায় ওইখানে থ্যাইকা ইছাপুরা খুব কাছে। আমার গাড়ি আছে, আপনারা পিছনে বসবেন, আর আমি আমার ভাই সামনে বসে যাব। আমি আর কোন কথারই উত্তর করলাম না। আমি খালি মনে মনে ভাবতে লাগলাম এই ঘটনার সমাপ্তি কোথায়? ভীষণ ভয় পেলেও বুঝতে দেইনি। রিক্সা চলছে শুনশান রাস্তা ধরে, রাস্তার ডানদিকে ফাঁকা জমি আর জঙ্গল, বা দিকটাতে কিছু বাড়ি আছে। কোন দোকান পাট নেই। রিক্সা একটা পাঁচতলা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো, কোলাপসিবল গেটের সামনে একটি ছেলে দাঁড়িয়ে, মনেই হলো এটি পূর্ব কল্পিত ঘটনা। কিন্তু আমার কিছুই করার নেই। অংশীদারী ভাইকে বললো আমার লাগেজ উপরে তুলে দিতে। আর ওনারে ধইরা উপরে নিয়া যা। আমি ওনারে নিয়া আইসতাসি। আমি ওই রিক্সার ও ভাড়া দিলাম। আমাকে পাঁচ তলায় ওঠালো। আমি আর পাচ্ছিলাম না, রেলিং ধরে ধরে কোন ভাবে উপরে উঠলাম। তারপরই লোকটি চলে এলো। লোকটি বললো বসেন, জল খান, আমি বললাম না আমি জল খাব না, এমন সময় লোকটি ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসে আবার একজন মহিলাকে নিয়ে এল। পরিচয় দিল বোন। আমি তখন হাঁপিয়ে গেছি কথা বলার ও ক্ষমতা নেই। এমন সময় লোকটি মাথা নিচু করে পায়চারি করছে আর বলছে 'সর্বনাশ হয়ে গেছে এখন কি হইবো? আপনার স্বামীকে পুলিশে ধইর‍্যা লইয়্যা গেছে। 'আমি বললাম কেন? কি কারনে? ঐ বুড়ো মানুষটাকে পুলিশ ধরে কি করবে? মাঝখানে ওদের পরিবারের লোকেদের মধ্যে খুব নিচু গলায় গালিগালাজ করছিল। এমন সময় হঠাৎ ফোন এলো (যদিও আমি কোনো আওয়াজ শুনতে পাইনি)। সেটা আমার দিবে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'কথা বলেন'। আমি মোবাইলটা ধরলাম কেউ একটা বলছে, 'হ্যালো আমি থানা থেকে বলছি, পুলিশ বলছি, আপনার স্বামীকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি। 'আমি বললাম কেন? সে বললো আমরা গাড়িতে চেকিংএ উঠেছিলাম ওনার কাছে ইন্ডিয়ান নোট পাওয়া গেছে। আমি বললাম ঐ সামান্য কয়েকটা টাকার জন আপনারা ওনাকে গ্রেপ্তার করবেন কেন? ততক্ষনে ফোন ছেড়ে দিয়েছে। আমি হ্যালো হ্যালো করছি, কোন সাড় নেই। এবার লোকটি বললো আর তো কোন উপায় নেই ওরা যখন একবার ধরেছে তাহলে আর সহজে ছাড়ে না। তারমধ্যে আবার ফোন এলো, আমি বললাম আপনি জেনে নিন তো কী করতে হবে? ফোন ছেড়ে দি বলছে, এখন ওনাকে আমাদের ছাড়াইয়া আনতে হইবে। তাহলে আমাদের কি করতে হবে? লোকটি বললো ছ

হাজার টাকা লাগবে ওনাকে ছাড়াইতে। আমি বললাম ছয়-হাজার টাকা তো আমার কাছে নেই। ' নেই, তাহলে গুনে দেখুন তো কত টাকা আছে? আমি বাংলাদেশি টাকা গুনে বললাম সাড়ে তিন হাজার টাকা আছে। ওটা আমার বুইনের কাছে রাখেন। সঙ্গে সঙ্গে লোকটি নিজের হাতে টাকাটা নিয়ে গুনতে লাগলো। আমি ততক্ষণে ইন্ডিয়ান ৫৫০০ টাকা একটি রুমালে মুড়ে না দেখিয়ে ব্লাউজের ভিতরে ঢুকিয়ে নিলাম, সাথে সাথে লোকটি আমাকে বলছে আমি আপনার বিপদের বন্ধু আমার কাছে মিথ্যা কথা বলছেন? যেটা লুকালেন সেটা গুনে আমার বোহিনকে দিন। আমি তাই করলাম। তারপর আমার কালো ব্যাগটা থেকে পাশে বসে সব ব্যাগে ভরে নিলাম। লোকটি এবার বলছে' এই টাকাতে ওনারা কিছুতেই ওনাকে ছাড়বে না'। ওদের চেনেন না। ইস পড়ে আইস্যা নিয়া যাইবেন। আমার হাতে একটা লোহা সোনা দিয়ে মোড়া ছিল। ওটা সবসময়ই আমি পড়ে থাকতাম। সেগুলো একে একে আমাকে দিয়ে খুলিয়ে নিয়ে নিল। এবার বললো আপনার ঐ আংটিটা খুলুন, আমি বললাম ওটা খোলা যাবে না। খুব শক্ত হয়ে লেগে আছে। লোকটি বলল সাবান দে তো ওনারে, আমি সর্বস্ব খুলে দিলাম। আমি বিষ্ণুপুরী সিল্কের শাড়ী পড়ে ছিলাম, তার দিকেও নজর পড়লো। শুনুন আপনারে ভিখারিনীর বেশে যেতে হবে। কান্নাকাটি করে স্বামীকে ছাড়াতে হবে, কাজেই এই শাড়ীটা ছাড়েন। লোকটি দরজার বাইরে দাঁড়ালো, আমি ঘরের এককোণে দাঁড়িয়ে শাড়ীটা ছাড়লাম, এবার ব্যাগটা নিয়ে রওনা দেব, তখন লোকটি ধমকের সুরে বললো আপনি কি স্টাইল দ্যাখাইতে যাইত্যাসেন? ওরা তো আপনার সাথে আরও জুলুম করবে, ব্যাগ রাখেন। তারপরে ব্যাগ থেকে আমাদের পার্সপোর্ট, ভোটার কার্ড, অরিজিনাল, জেরক্স একটা প্লাস্টিকের ভিতরে ভরে দিয়ে আমাকে বললেন এগুলি নিয়ে যান থানায় লাগবে। আমি ওগুলো নিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরে থেকে বেরিয়ে গেলাম, দেরী হয়ে গেলে আমার স্নীকার জুতোটাও না পরে ওদের একটা চটি চেয়ে পরে বেরিয়ে এলাম। নিচে নেমে কিছুটা দূরেই দেখলাম একটা রিক্সা দাঁড়ানো। লোকটি আমাকে আর তার পাতানো ভাইটিকে রিক্সায় তুলে দিলো, আমি বললাম আমার কাছে কিন্তু কোনো টাকা নেই। লোকটি বললো 'আরে আপনে টেনশান করেন ক্যান? আমরা তো আছি। এই নেন, বলে আমাকে ১০০ টাকার নোট দিল। আর আমাকে শুনিয়ে বললো ওনাকে নিয়ে গিয়ে দাঁড়াইয়া থাক, আমি সকলকে নিয়া আইত্যাসি। ওনারে ছাড়াইয়া লইয়্যা আসুম।

এবার রিক্সা অন্য রাস্তা ধরলো। সোজা এসে রেল লাইন পেরিয়ে মতিঝিলের থেকে যাত্রাবাড়ী নূতন ফ্লাইওভারের পাশে রাস্তার একটা মোড়ে সাধনা ঔষধালয় ও ইউনানী চিকিৎসাকেন্দ্র নীচে একটা ফলের দোকানের পাশে রাস্তার মোর আমাকে দাঁড় করিয়ে রেখে, বললো আপনি এখানে অপেক্ষা করেন, আমি ওদের নিয়ে আসছি। এই বলে ভাই নামের লোকটি চলে গেল। তখন সকাল ৭টা বাজে। আমার হাতে ঘড়ি নেই ও মোবাইল নেই যে সময় দেখবো।

তখন আমি একজন অসহায়, নিঃস্ব, অপরিচিত স্থানে একা, সম্বলহীন কিংকর্তব্যবিমূঢ় নিষ্পলক নেত্রে দাঁড়িয়ে রইলাম আমার স্বামীর অপেক্ষায় ... । আর ভাবছি ওরা কেউ আর আসবে না। তবে আমার স্বামী আমার খোঁজে ঘুরতে যদি একবার এইদিকে আসে, তাহলে একটা বিহিত তাও হতে পারে। এদিকে আমার দাঁড়িয়ে থাকতে

থাকতে পা কোমরে ব্যাথা হতে শুরু হয়ে গেছে। আমার সাথে সাথে মাথায় এলো এবার আমাকে কিছু একটা করতে হবে এবার সামনের যে জেরক্স এর দোকান ছিল সেখানে জিজ্ঞাসা করলাম, দাদা কটা বাজে? বাংলাদেশের সময় আমাদের সময়ের থেকে ৩০ মিনিট মানে আধঘন্টা এগিয়ে থাকে। লোকটা বললো বারোটা বাজতে আর পাঁচ মিনিট বাকী। আমি সাথে সাথে ঠিক করলাম যে স্থান ত্যাগ করে আমাকে আমার কাজ করতে হবে। আমি তখন ফলের দোকানীকে বলে গেলাম যে কেউ যদি আমাকে খুঁজতে আসে বলবেন আমি সামনেই গেছি, উনি যেন অপেক্ষা করেন। এই বলে আমি সামনের দিকে এগোতে লাগলাম। প্রায় ছয়টা রাস্তা পার হয়ে ফ্লাই ওভারের নীচে দিকে নেমে একটা দোকানে জিজ্ঞাসা করলাম থানাটা কোথায়? তারা দেখিয়ে দিল সোজা। আমি সেই মত এগিয়ে দেখলাম সেই জায়গাটা যেখানে আমাকে আমার স্বামীর থেকে আলাদা করা হয়েছিল। তারপরে ফুটপাতে উঠতেই প্রায় থানার দেওয়ালের পাশে একটা দোকানে জিজ্ঞাসা করলাম "আচ্ছা থানার গেট টা কোথায়? সে বললো আপনি মুখটা সামনের দিকে ঘুরিয়ে এগিয়ে যান পেয়ে যাবেন। এবার আমি তাই গেলাম, কয়েকটা দোকান ছাড়িয়ে একটা দেওয়াল শুরু হয়েছে। 'খুব উচু ভেতরের কিছুই দেখা যায় না। প্রায় আধমাইল জুড়ে দেওয়ালটা। আমি চলতে লাগলাম। কোন মানুষকে পথে চলতে দেখলাম না। কিন্তু নীচের রাস্তা দিয়ে আপ ডাউন প্রচুর গাড়ী চলাচল করছে। এবার দেখতে পেলাম দেওয়ালের শেষে চওড়া একটা প্রবেশ পথ তবে কোন গেট নজরে পরে না। সামনে তাকাতেই দেখতে পেলাম কতকগুলো গরু জাবর কাটছে। আর বাঁদিকে কিছু ঝোপ জঙ্গল কোন থানার পরিবেশ বলে মনে হল না। তবুও চোয়াল শক্ত করে কিছুটা এগিয়ে দেখি একটা প্রিজন ভ্যান দাঁড়িয়ে। আরও একটু এগিয়ে যেতে দেখি ভ্যানের পিছনে দু-জন বন্দুকধারী সিপাই দাঁড়িয়ে আছে। এবার তাদের মাঝখানে দিয়ে এগিয়ে গেলাম দেখলাম ছোট্ট একটা দোতলা ভবন। সামনে দিয়ে সিড়ি উঠে গেছে। সিড়ির পাশে একজন পিস্তল নিয়ে গার্ড বসে আছে। একটু বয়স্ক, আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম ওসি কোথায় বসেন? উনি সোজা দোতলায় উঠে যেতে বললেন। আমি একটা সিড়িতে পা দিয়ে ঘুরেই জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কী একজন বয়স্ক মানুষ, পায়জামা-পাঞ্জাবী পরা এসেছিলেন? ভদ্রলোক আমাকে বললেন আপনি কি তার স্ত্রী? আরে আসেন, উনি আপনার জন্য কখন থেকেই তো ছটফট করছেন। এই বলে আমাকে সিড়িতে উঠিয়ে নিয়ে গেল। আমার স্বামীকে পাঁজা কোল করে তুলে এনে বললেন এই দেখুন আপনার স্ত্রীকে এনে দিলাম। আমি দেখলাম আমার স্বামীর মুখে নির্মল একগাল হাসি। আমাকে প্রশ্ন করলেন 'তুমি কোথায় গিয়েছিলে'? আমি বললাম কোনো ভাবে প্রাণে বেঁচে এসেছি। আমার সর্বস্ব নিয়ে নিয়েছে। সামনেই থানার সেকেন্ড অফিসার বসে ছিলেন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আপনাকে কোথায় নিয়ে গিয়েছিল? আপনার কি কি নিয়েছে? আপনি কি জায়গাটা চিনিয়ে দিতে পারবেন? আমি বললাম হ্যাঁ পারবো। কী কী গিয়েছে আমি একে একে বলতে লাগলাম, আমার স্বামী বললেন আপনি লিখুন আমি বললাম হ্যাঁ আমি বলছি। উনি বললেন ওটা এই থানার ঘটনা নয়। আমি তবুও তাকে বলতে লাগলাম সে এমন রেগে গেল আর বলতে লাগল যান যান এটা এই থানার ব্যাপার নয়। আমি সাথে সাথে বললাম আপনি এভাবে কথা বলছেন কেন? আমরা তো বিপদে পড়েই আপনাদের কাছে এসেছি। তখন ওসি ওনাকে ধমক দিয়ে বললেন ওনাদের সাথে ভালো করে কথা বলুন। এরমধ্যে বাঁদিকে তাকিয়ে দেখি আমার স্বামীর বন্ধু ঢাকা থেকে এসে গিয়েছেন। তিনি বললেন ওসব জিনিসের মায়া ছাড়তে হবে, না হলে বিপদে পড়তে

হবে। এখন তাড়াতাড়ি ইছাপুরা গ্রামে ফিরে যেতে হবে। তারপর আমরা বাসে করে ইছাপুরার উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। বাস ড্রাইভার, কন্ডাকটার আমাদের অঘটনের কথা বলছে। গোটা ইছাপুরা ও সিরাজদিখানে ছড়িয়ে পড়েছে এই খবর। আমাদের নিয়ে যাবার জন্য তারা বাসস্ট্যান্ডে জড়ো হয়ে অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়িয়ে আছে। আর সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষদের বাড়ীতে গিয়েছিলাম। ফলে তারা প্রত্যেকেই ভীষণভাবে দুঃখিত এবং লজ্জিত। তারা রীতিমত কেঁদে ফেলেছে। তারা একথাও বলছেন যে এটা আমাদের দেশের অপমান। ওনারা সবধর্ম নির্বিশেষের মানুষ আমাকে সান্তনা দিতে লাগলেন। যে আমি যেন কোন চিন্তা না করি। ওনারা সব সামলে দেবেন। ওনারা অনেকে আছেন অনেক বাড়ী আছে আপনারা থাকতে পারবেন। কোন অসুবিধা হবে না, বিদ্যালয়ের মাষ্টারমশাইরাও তাঁদের বাড়ীতে থাকতে বললেন। এছাড়া তারা প্রত্যেকেই বললেন ঈদ ও দূর্গাপূজা শেষ হলে যাবেন। আমাদের মনের অশান্তির জন্য আমরা আর থাকতে চাইলাম না। ওদের বললাম যত দামেই হোক যটার সময়েই হোক ইন্টারনেটে দুটো টিকিট কেটে দিতে। সুধীরবাবু ঢাকা থেকে টিকিট পাওয়ার চেষ্টা করলেন। পেলেন না। কিন্তু উনি ইন্টারনেটের 'বিকাশ নামে একটি কেন্দ্রের ফোন নম্বর দিলেন তার থেকে অনেক চেষ্টা করে সকাল ৭টার দুটো টিকিট পেলেন। ১৪ই অক্টোবর, ২০১৩ বিজয়া দশমীর দিন আমরা খেয়ে বেলা ৪টার পরে ইছাপুরা থেকে রওনা হলাম। যাওয়ার সময় সকলের কান্নাকাটি, প্রত্যেকের মন খারাপ, আমাদেরও ভীষণ খারাপ লাগছিল। মনে হলো আপনজনদের ছেড়ে দূরে চলে যাচ্ছি। আসার সময় সুধীর বাবু আমার স্বামীকে আংটি দিলেন, যদিও তিনি আবার ফেরৎ দিয়ে দিয়েছিলেন কারণ উনি এসব একদম পছন্দ করেন না। আমার পায়ের মাপ নিয়ে গিয়ে জার্মানী সাহেব জুতো কিনে দিলেন। ওনার ভাগ্নে ঢাকাই জামদানী কিনে দিলেন। আমার ভাসুরের বন্ধু সামসেদ আহমেদের দাদা কেঁদে ফেললেন এবং জোর করে আমাদের মোবাইল কেনার টাকা দিলেন। আমাদের খুবই লজ্জা লাগছিল। কিন্তু এত আন্তরিকতায় সাথে ওনারা এগুলি দিলেন যে গ্রহণ না করে পারলাম না। আসলে এই ঘটনা ঘটার অনেকগুলি কারণ ছিল। এই সময়টা পর্যটকদের জন্য উৎকৃষ্ট সময় নয়। প্রথমকথা হিন্দুদের ও মুসলমানদের প্রধান দুটো বড় উৎসব দুর্গাপূজা ও ঈদ। আর সেই কারণেই রাস্তার মোড়ে মোড়ে এবং বড় কোন ফাঁকা জায়গায় গরু ছাগলের হাট বসে। তাকে কেন্দ্র করে প্রচুর টাকা পয়সা লেনদেন হয়। ফলে রাস্তা ঘাট আটকানো, তাছাড়া আওয়ামি লীগের পরিচালিত সরকারের মেয়াদকাল ফুরিয়েছে, ফলে প্রশাসন ঢিলেঢালা, তাছাড়া যাত্রাবাড়ী থানার অবস্থানটা মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নয়। থানার চারদিকে সুউচ্চ প্রাচীর ঘিরে ঘেরা, সুতরাং পুলিশের চোখে রাস্তার কোন কুকর্মই চোখে পড়বে না, ভিতরের এককোণে থানা থাকায় অপরাধীরা নির্বিচারে অপরাধ করে চলেছে। অর্থাৎ থানাই সুরক্ষিত, বাকী পথচারী একেবারে অরক্ষিত।

বাংলাদেশের প্রশাসনিক ব্যবস্থা আরও মজবুত ও বিজ্ঞানসম্মত হওয়া দরকার। দেশের মানুষদের সৎভাবে উপার্জনের পথ তৈরী করতে হবে। আরও পর্যটক টানতে হলে তাদের অসুবিধাগুলি দূর করে চলার পথে সব বাধা দূর করে সুষ্ঠ পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

ছোটোদের ফাস্ট ফুড খাওয়া এখনই বন্ধ করা প্রয়োজন

শ্রী রমাপ্রসন্ন দত্ত

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের ফুড সেফটি অ্যান্ড স্ট্যান্ডার্স অথরিটি অফ ইন্ডিয়া'র (এফ.এস.এস.এ.আই) সম্প্রতি আদালতের নির্দেশে একটি সমীক্ষার সিদ্ধান্ত নেয়, ছোটোদের ওপর ফাস্ট ফুড এর কী প্রভাব তা জানবার জন্য। এর জন্য আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এক সমীক্ষক সংস্থাকেই এই সমীক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়। সারা দেশের ছশোটি স্কুলের আঠারো হাজার ছাত্রছাত্রী, স্কুলগুলির অধ্যক্ষ-অধ্যক্ষা, বাড়ির লোকজন সকলের সাথে আলোচনা করে তৈরি করা হয় রিপোর্ট। যাকে এই সময়ে সবচেয়ে বড় সমীক্ষা রিপোর্ট বলে দাবি করেন এফ.এস. এস. এ. আই সংস্থার তরফে। ২০১২ সালের নভেম্বর থেকে এপ্রিল ২০১৩ দীর্ঘ ছ'মাস ধরে সমীক্ষা করা হয়েছে। এই রিপোর্ট প্রস্তুত করার জন্য। এখন দেখা যাক, কী পাওয়া গেল এই সমীক্ষায়।

দেশের এই আঠাশ শতাংশ স্কুলের বাচ্চারা এই ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুড খাবারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। এটা তাদের অতি আবশ্যক নেশার মতো অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। শিশুদের প্রয়োজনীয় ভিটামিন, প্রোটিন আর মিনারেলের বদলে এ সব খাবারে ভরে আছে অতিরিক্ত নুন, চিনি ও ফ্যাটে। এর ফলে বাচ্চাদের ওপর সংঘাতিক প্রভাব ফেলছে। ছোটোদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে অতিরিক্ত মোটা হওয়া বা ওবেসিটি, হাইপারটেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টরল সহ একাধিক ক্ষতিকারক উপাদান বৃদ্ধি বা ডিসলিপিডিমিয়া, ইমপেয়ারড গ্লুকোজ টলারেন্স (ডায়াবেটিসের আগের অবস্থা) এসব রোগের লক্ষণ, এমনকি ভবিষ্যতে হার্টের রোগের আশঙ্কাও রয়েছে। এই রিপোর্ট জমা পড়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রকে। মন্ত্রক সহমত হয়ে তা জানিয়ে দিয়েছে আদালতকে। এই রিপোর্টে আরো বলা হয়েছে বাচ্চাদের স্বাস্থ্যকর খাদ্য অভ্যাস গড়ার জন্য জোর প্রচার করা এবং সচেতনতা কর্মসূচি পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। ছোটোদের স্কুলের নিকট বিক্রয় হওয়া খাবারের পুষ্টিগুণ উল্লেখ করার সুপারিশ করা হয়েছে; প্যাকেট করা অথবা খোলা খাবারের ক্ষেত্রে।

পৃথিবীর মধ্যে ভারত ডায়াবেটিস ও হার্টের অসুখের রাজধানী। আর সুগারের রোগী প্রায় সাড়ে ছয় কোটি। হার্টের অসুখ এক কোটি সত্তর লক্ষের মতো। এই সব অসুখগুলি একটির সাথে অপরটির সম্পর্ক নিবিড়। বিশিষ্ট এক এন্ডোক্রিনোলজিস্ট বলেন, টাইপ টু ডায়াবেটিসও এখন স্কুলের বাচ্চাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুড বেশি খাওয়া ও পরিশ্রম না করা এর প্রধান কারণ। এক স্বনামধন্য হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ বলেন, এ কথা ভাবলে অবাক লাগে যে ২১ ও ২৪ বছর বয়সের তরুণরাও এখন হার্ট অ্যাটাক-এর শিকার হচ্ছে।

আর বিলম্ব না করে সব স্কুলে ফাস্ট ফুড ও জাঙ্ক ফুডের ক্ষতিকর বিষয়ে সচেতনতার কর্মসূচি নেওয়া প্রয়োজন। ছাত্র-ছাত্রী ও পিতা-মাতা সকলের জন্য। এক শিশু চিকিৎসকের মতে আগের তুলনায় এখন বাচ্চাদের মধ্যে মোটা হওয়া, সুগারের আগের অবস্থা, কোলেস্টেরল, স্লিপ অ্যাপনিয়া প্রভৃতি সমস্যা ৫০ শতাংশ বেড়েছে। স্কুলের বাচ্চাদের মধ্যে ৩০ শতাংশ বাচ্চাই মোটা,তার একমাত্র কারণ ফাস্ট ফুড।

২রা মার্চ ২০০৯ এ ত্রিগুণা সেন অডিটোরিয়ামে ডঃ নর্মান বেথুনের জন্মদিন উপলক্ষে মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিমল চ্যাটার্জী, কানাডা ও চীনের হাই-কমিশনার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার ও প্রাক্তন মেয়র বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য।

গত ২০শে মার্চ ২০১১ সালে মোল্লাহাট বস্তি অঞ্চলে সম্মাননা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে প্রবীন ব্যক্তিদের সম্মাননা জানাচ্ছেন সংস্থার সভাপতি পেলব মুখার্জী।

১লা অক্টোবর বিশ্ব প্রবীন নাগরিক দিবসে জগদীশ দাসকে সম্মানিত করছেন সহ-সম্পাদক স্নেহাংশু চাকদার।

VOL. II Issue : XII, 13th March, 2014 PRABINBARTA Postal Regd. No. KOLRMS/449/2013-15

যুদ্ধক্ষেত্রে অপারেশন রত ডাঃ হেনরি নর্মান বেথুন

Printed by Intergraphics. Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre, Ph : 033 2473 9642, 033-2414 7777 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.